বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীমতী কল্যাণী সেন, এম্. এ., বি. টি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৩

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY DINABANDHU GANGULEE, B.A.,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

উৎসর্গ

দাদামশাই ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সন্দেশ"এর ভাণ্ডার থেকে রসসঞ্চয় করে বাংলা ভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মেছিল; তাঁর ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী পড়ে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলি প্রথম চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। শিশুকালের সেই অপরিশোধনীয় স্নেহঋণের স্মরণে এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎসর্গীকৃত হ'ল।

সূচী

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা-শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকেরও যে শিক্ষা-অর্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা এদেশে পূর্ব্বে কেহ মনে করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এখনও যে সকলে ইহার উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না। কারণ, বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের পক্ষে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করা এখনও একশ্রেণীর লোকের নিকট বাহুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইঁহাদেব মনোভাব এই যে, যেহেতু বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, সেহেতু নূতন করিয়া উহা শিখিবার আর আবশ্যকতা কি ? তবে সুখের বিষয়, এই শ্রেণীব লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গলাভাষার মর্য্যাদা-বৃদ্ধি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার জন্য পূরা দুইশত নম্বরের পাঠ্য-প্রবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালাশিক্ষার দিকে এখন অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, অন্ততঃ পরীক্ষার্থিগণ এখন আর বাঙ্গালাশিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কবিতে পারে না।

বাঙ্গালাভাষা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালাশিক্ষা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইংরেজ বালক-বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইংরেজীভাষার শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে বিলাতে যে রাশি রাশি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই লিখিত, এবং তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন না যে তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী-শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই। শুধু বিলাতে কেন,

ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং মার্কিন অঞ্চলেও মাতৃভাষা-শিক্ষার জন্য নব নব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নিত্যই উদ্ভাবিত হইতেছে।

ভাষাশিক্ষা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সকল গবেষণা-মূলক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেকাংশই বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায়। ভাষাশিক্ষার মূল তত্ত্বগুলি সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষারও নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কল্যাণী সেনের এই পুস্তকে উক্ত দুই দিক্ই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার লেখা শুধু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রণালীগুলির পুনরাবৃত্তি নহে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিও বটে। সুতরাং বাঙ্গালার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ এই গ্রন্থ হইতে অনেক প্রকার শিখিবার ও ভাবিবার বস্তু পাইবেন, এইরূপ আশা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে L. T. ও B. T. Courseএ বাঙ্গালাভাষার শিক্ষাপদ্ধতি পাঠ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুলিখিত গ্রন্থের একান্ত অভাব। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী এই অভাব-মোচনে যত্নবতী হইয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই অনতিবৃহৎ অথচ মূল্যবান্ পুস্তক-খানি এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হইয়া বাঙ্গালার শিক্ষাবিদ্‌গণকে সচেতন করিয়া তুলিলে, শিক্ষায়তনে সত্যসত্যই নবযুগের সঞ্চার হইবে।

১০ই শ্রাবণ,
১৩৫০

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

বাংলাশিক্ষাপদ্ধতির অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করবার সময়ে পুস্তক রচনার কল্পনা মনে ছিল না; কিন্তু কাজে অবতীর্ণ হয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন বই প্রকাশিত হয়নি।

ইংরেজিতে লেখা "ভার্ণাকুলার" শেখাবার বই এবং ইংরাজের মাতৃভাষার শিক্ষাপুস্তক অবলম্বন করে ছাত্রীদের জন্য "নোট" তৈরি করতে বসলাম। দেখতে পেলাম, সমস্ত উদাহরণ বিদেশী, সকল পদ্ধতি বিজাতীয়। সেগুলিকে বাংলাভাষায় প্রযোজ্য করতে হ'লে যতটুকু পরীক্ষা ও ব্যবহারের ভিত্তির প্রয়োজন তার একান্ত অভাবই লেখিকাকে এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত ক'রল। ছাত্রজীবনের স্মৃতি এবং অধ্যাপক ও পরীক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত করে বিদেশী রীতিগুলিকে বাঙালী করতে উদ্যত হলাম; মাঝে মাঝে স্বাধীন-চিন্তায় স্পর্ধাও করেছি, কাজে কতদূর সফল হয়েছি জানি না।

বাংলাভাষাশিক্ষার প্রসারকল্পে অক্লান্তকর্মা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সামান্য গ্রন্থের মুখপত্র লিখে দিয়ে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে যে উপকার করেছেন, তার জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁর সহায়তা না পেলে অখ্যাতনাম্নী গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব হ'ত না।

বাংলাশিক্ষাপদ্ধতির আলোচনায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু একজন পথপ্রদর্শক। তিনি অত্যন্ত অসুস্থতাসত্ত্বেও বইখানির

পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'রে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। অনেক তর্ক করেছি, বহু অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু তাঁর ধৈর্য বিচলিত হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় এ কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তৎরচিত "বাংলা পড়ানো" বইখানা থেকে সাহায্য পেয়েছি ব'লে তাঁকেও স্মরণ করছি।

আমার জ্ঞাত অজ্ঞাত আরো অনেকে এই বইয়ের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত হয়েছেন; তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি

মাতৃভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে-কোন ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সেই ভাষাটি ব্যবহার করবার ক্ষমতা-লাভ। বাঙালী যখন ইংরিজি বা হিন্দীভাষা শেখে তখন তার এই প্রয়োজনের দিকটা মুখ্য হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদির জন্য রাজভাষা ইংরিজির জ্ঞান আমাদের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয়। হিন্দীভাষাও নানা কারণে ভারতের অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয় বলে এর শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হলেও যেমন-তেমন করে অনেকেই হিন্দী বলতে পারে।

ভাষাশিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাহিত্যরসের উপভোগ। মানুষ-মাত্রেই অন্তরে অন্তরে শিল্পী, সে কোন একটা ভাষা শিক্ষা করে সেটাকে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্য পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়। ভারতবাসী ইংরিজি শিক্ষা করে সরকারের তাগিদে, কিন্তু ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করেই ক্ষান্ত হয় না; আলোচনা করে, কবিতা, উপন্যাস ও নানা প্রকারের জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে, পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। যে-কোন ভাষাই শিক্ষা করা হোক না কেন ভাষার এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে তার রস তার কাজের ব্যাপারটিকে ছাপিয়ে ওঠে।

মাতৃভাষা এমন একটি ভাষা যে শুধু কাজ করে না, শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের সমস্ত জীবনটাকেই গড়ে তোলে আর ঘিরে রাখে। মানবসত্তার প্রথম বিকাশ যে আত্মপ্রকাশ তা মাতৃভাষাব সাহায্যেই হয়। শিশু যখন প্রথম কলধ্বনি করে, যখন প্রথম তার মাকে 'মা' বলে ডাকে, তখন সেটা তার কাজের কথা নয়, তার চেতনার বিকাশ, তার প্রথম আত্মবোধ। মানবের প্রথম আত্মপ্রকাশের বিরাট্ গৌরব তার 'মা'-ডাকে মাকে অবলম্বন করে জেগে ওঠে। এই আত্মপ্রকাশ অন্নবস্ত্রের চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়।

আত্মপ্রকাশ ও ভাবেব আদান-প্রদানের উপরই মানুষের চেতনা প্রতিষ্ঠিত। মানুষ বেশীদিন একা থাকলে যেমন পাগল হয়ে যায় তেমনি যে পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পাবে না সে কখনও পূরো মানুষ হযে উঠতে পারে না। মাতৃভাষাই সম্পূর্ণ আত্মিক বিকাশের একমাত্র বাহন। যে বাঙালী নিজের ভাষায় ভাল করে আত্মপ্রকাশ করতে শিখল না, সে শুধু বাঙালা নয়, পূরো মানুষই হতে পারল না। এই দিকটায় শৈথিল্যেব জন্যই হয়ত বাঙালী ভাল চাকরে হচ্ছে, ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার হচ্ছে, কিন্তু জাতিহিসাবে পূর্ণতার পরিচয় দিতে পারছে না।

শিশুর সমস্ত সত্তা, সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে রূপ নেয়; এই বিরাট্ মহীরুহের অঙ্কুরকে যদি যত্ন করে বাঁচিয়ে না রাখা যায় তবে মানুষটিকেই বিকৃত করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন একটি প্রথা প্রচলিত আছে যার দ্বারা শিশুকে জোর করে তার মাতৃভাষার পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করে ভাঙা হিন্দী অথবা ফিরিঙ্গী ইংরিজি অবলম্বন করতে শেখান

হয়। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা'-প্রবন্ধে বলেছেন— "বাপ-মা বহু অপব্যয়ে, বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য ও বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে * * * * ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে।"

সৌভাগ্যক্রমে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এরা মুষ্টিমেয় মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্য ও ভয়ের কারণ এই যে, এই মুষ্টিমেয়ের মতবাদ সমস্ত শিক্ষাযন্ত্রটিকে প্রভাবিত করছে। তাই দেখা যায় যে প্রতিবৎসর দলে দলে এমন সব ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেরোয় যাদের বাংলার প্রতি অবজ্ঞা যেমন গভীর ইংরিজির জ্ঞানও তেমন নগণ্য। আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করেছি, স্বাধীনতাপ্রয়াসী হয়েছি, কিন্তু স্বেচ্ছায় ধারণ করা এই দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়নি।

এতদিন ধরে বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে বাংলাভাষা যে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছে তাই আমাদের জাতীয়চরিত্রের অবনতির অনেকটা কারণস্বরূপ বলে ধরা যায়। জাপান যখন আবিষ্কার করল যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিনা আধুনিক যুগে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়, তখন সে মাতৃভাষার মধ্যেই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রবর্তন করে বড় হল; আর আমাদের দেশে প্রাচ্যভাবাপন্ন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ভাষাটিকেও বর্জন করা হয়েছে। অথচ সেই পাশ্চাত্ত্য-দেশের অধিবাসীরাই বহুকাল আগে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের ভাষায় সম্ভব।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার মধ্যে বাংলাকে যত কম সময় দেওয়া হত তাতে ছাত্রেরা কতকগুলি

বাছা-বাছা সাহিত্যাংশের সম্মুখীন হয়ে কিছুক্ষণের জন্য সেগুলির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুরই অবসর পেত না। তার ফলে বাঙালীর স্বভাবও তেমনি ভাবে বেড়ে উঠেছে,—বাঙালী কবিতা লেখে, সাহিত্য আলোচনা করে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, কিন্তু কাজ করতে পারে না। জাতীয় সাহিত্য যে জাতি-গঠনে কতটা কার্যকরী বাঙালী জাতিকে দিয়েই নিষেধমুখে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিছুদিন থেকেই দেশের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এদিকে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যার মূলানুসন্ধান করেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর জ্ঞানপিপাসার অভাবের জন্য খেদ করেছেন, ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলে গিয়েছেন শুধু গল্প ও কবিতাগুচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সাহিত্য হয় না। শেষোক্ত মহাপুরুষের উদেযাগে ও তাঁ'র পুত্রের উদ্যমে আজ এই দুর্দশা মোচনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

বাংলাভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হওয়ার পর থেকে মাতৃভাষার শিক্ষকের দায়িত্ব অতি গুরুতর হয়ে উঠেছে, কেন-না দেশের এক বিশেষ দুরবস্থার দিনে মানুষ তৈরী করবার সুযোগ ও কর্তব্য তাঁর হল।

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার ফলে আর একটি মহা বিপদ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনে ঘটছিল। বাঙালী পরের ভাষায় তার সব জ্ঞান অর্জন করার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে আপনার করে নিয়ে কাজে প্রয়োগ করতে পারছিল না। বাঙালীর মধ্যে এক সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়া মৌলিক প্রতিভা ও সৃজনশক্তির বিকাশ দেখা যায় না বল্লেই হয়, কেন-না আত্মপ্রকাশের একমাত্র যন্ত্র মাতৃভাষার যার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই সেই বিদ্যা কেবল

দাসত্বের বা কেরানীগিরির মার্কা হয়ে ওঠে, গৃহে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। শিক্ষার পরিপাকের এই অভাবের প্রতি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার হেরফের" নামক প্রবন্ধে বলেছেন "আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা অন্য কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। * * * অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রা দুইই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।" শিক্ষা-পদ্ধতির এই ভুলই এক দিকে বহু অবজ্ঞাত 'বাবু' শ্রেণীর ও অপর দিকে জাতির পরগাছা 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের পরিপোষক।

মাতৃভাষার শিক্ষককে এই দায়িত্ব সজ্ঞানে তুলে নিতে হবে। তাঁকে শিশুর অঙ্কুরকে পূর্ণমানবরূপ মহামহীরুহে পরিণত করতে হবে। মাতৃভাষাকে গৌরব দান করে ছাত্র নিজে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে পারবে, মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে তার শিক্ষা সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠবে; উপরন্তু ভাষার ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যতের কর্মজীবনের কঠিন মেরুদণ্ড গঠিত হবে।

পরভাষায় শিক্ষা-পদ্ধতির তৃতীয় বিপদ এই যে, তাতে দেশের জনসাধারণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থেকে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন—যে-কথা বাংলায় কথিত না হবে সে-কথা বাংলার আপামর জনসাধারণের অনধিগম্য থেকে

যাবে, তাই বঙ্গদর্শনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামঞ্জস্যসাধনের দূতরূপে বাংলার প্রতি ঘরে পাঠাবার ব্রত নিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের যে বিরাট্ ব্যবধান এমন আর পৃথিবীর কোন সভ্যদেশেই নাই। বিজাতীয় শিক্ষাই এর মূলীভূত কারণ; এর জন্যই শিক্ষিত বাঙালী অশিক্ষিত ইংরাজের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির মিল পেতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে তার যোগ নাই।

বাংলাভাষাকে বাহনরূপে আশ্রয় করে শিক্ষা ও ভাষা জাতীয় জীবনে দুইই সফল হয়ে উঠবে। হয়ত কিছুদিন এই পদ্ধতি-অনুসারে অগ্রসর হলে বাঙালী জাতি সমগ্রভাবে একাত্মবোধে জাগ্রত হতে পারবে। সেদিন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সেই মিলনেব সময়ে আশুতোষের স্বপ্নদৃষ্ট বঙ্গভারতীর মন্দির বাস্তবে পরিণত হবে।

শিক্ষাকালের স্তরবিভাগ

(১)

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বয়স ও পরিণতির দিক দিয়ে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। বিদ্যালয়ের নিম্নতম চারটি শ্রেণীকে শিশুশ্রেণী বলে ধরা যায়। শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন সে প্রায় কিছুই জানে না, তাকে বিশুদ্ধ-ভাবে কথা বলতে পর্যন্ত শেখাতে হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশ সব শিক্ষার মূল, তাই সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই বোধ জাগ্রত করতে হয়। শিক্ষকের সঙ্গে নানা পরিচিত বিষয়ের কথা বল্লে শুধু যে শিশুর ভাষার উপর দখল বাড়বে তা নয়, স্কুলকে যারা ভয় করে তারা বুঝবে যে স্কুল একটা কোন বিজাতীয় ব্যাপার নয়, তাতে তাদের ভয় ভাঙবে; তাছাড়া শিক্ষাপদ্ধতির যে দোষের জন্য ঘর এবং বিদ্যালয়, জীবন ও বিদ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় সেই দোষ দূর হবে।

ভাষার উপর কিছুটা দখল হলে পর শিশু পড়তে শিখবে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে আজকালকার শিশু "অ-আ-ক-খ" মুখস্থ না করেও আনন্দের মধ্যে দিয়ে বর্ণ-পরিচয় লাভ করে, তবে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য-সাধনের মুস্কিল হতে পারে। লিপির প্রতীকদ্যোতকতার তত্ত্ব শিশুর বোধগম্য হবে না, কিন্তু তার স্বভাবের চিত্রধর্ম এত প্রবল যে, লিপি যে

ভাব ও বস্তুবাচক শব্দের ছবি একথা তাকে বোঝান বেশী আয়াসসাধ্য হবে না। তা ছাড়া মানবজাতির বহুযুগের লেখা-পড়ার অভ্যাসের ফলে আধুনিককালের শিশু সহজেই পড়তে ও লিখতে শেখে।

এ সময়কার শিক্ষার মূল প্রধানত আনন্দ। আনন্দের উপব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাতেই শিশুর পূর্ণমনোযোগ পাওয়া যাবে এবং পড়ার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে যাওয়ার ফলে তার বৃত্তিসমূহেব পূর্ণপরিণতি সহজলভ্য হবে। এইজন্য শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা খেলার মধ্যে দিয়ে হওয়া চাই।

সাহিত্যরসেব উপলব্ধি এত অল্প বয়সের শিশুর পক্ষেও সম্ভব। শিশুর সাহিত্যবোধ তার আদিম জীবনসম্ভোগের আনন্দজাত, এরই উপর পূর্ণমানবতার ভিত্তি। এই বয়সের সজীবতা ও সরসতাকে পুষ্ট করতে না পারলে সে সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। শিশুমনের প্রত্যেক বৃত্তির বিকাশের নির্দিষ্ট সময় আছে, তা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই বৃত্তি চিরনিরুদ্ধ থেকে যায়। রসবোধের সম্বন্ধেও সে কথা সত্য ; তাই খেলা, গান, ছবি ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে শিশুর সৌন্দর্য ও আনন্দের স্পৃহার চরিতার্থতাসাধন করে তার বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে।

(২)

বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী অবধি দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া যায়। এই বয়সের শিশুর শিক্ষকতা-কার্য সব চেয়ে কষ্টসাধ্য।

এই সময়টি বালক-বালিকার বয়ঃসন্ধিকাল। এটি ছাত্র-জীবনের একটি অবস্থাসঙ্কট বলে এই সময়ে মাঝে মাঝে তাদের ব্যবহারে নানা বিপর্যয় দেখা গিয়ে থাকে ; যথা, হিষ্টিরিয়া, অযথা চাঞ্চল্য ইত্যাদি। অথচ এইটি আবার সব চেয়ে মূল্যবান সময় এবং এরই সঠিক পরিচালনের উপর ছাত্রের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই সময়ে তার মনের যে মোড় দেওয়া যায় তদনুযায়ী সে মানুষনামের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত হয়। কাজেই এই সময়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব খুব বেশী।

বয়ঃসন্ধির সঙ্কট এড়ান কঠিন নয়। এই সময়ের চাঞ্চল্যের মুখ্য কারণ এই যে, বালক-বালিকার পরিণতিশীল শরীর-মনের কতকগুলি পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং জগতের সঙ্গে নূতন করে বোঝাপড়া করার প্রয়োজন হয়। এইজন্য এই সময়ে তাদের যতদূর আনন্দপূর্ণ ও আগ্রহ-জনক পরিস্থিতির মধ্যে রাখা যাবে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনাও তত কম হবে।

অনেক সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিণতির অসামঞ্জস্যের জন্য এই সময়টা সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। দেহ যখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলে তখন মনের খোরাক উপযুক্ত পরিমাণে না জুটলে অলস মনে নানাপ্রকার চিন্তার উদ্রেক হবেই। আত্মসচেতনতার অতিরেক থেকে ছাত্রদের বাঁচাতে হলে তাদের মনকে নানাদিকে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট করতে হবে। এই সময়ে যে-সব অস্বাভাবিক বালক-বালিকা (Problem children) দেখা যায় তাদের অধিকাংশের ব্যতিরেকের কারণ এই অসামঞ্জস্য।

এই সময়ে কেবল আত্মলাভ ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এখন বালকবালিকার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের

পথ খুঁজতে হবে। এই অবস্থার সাহিত্যশিক্ষা ভাষার ব্যবহার-শিক্ষার উপরকার স্তরের, সচেতনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃষ্টির সাধনা, তাই এখন পরিপূর্ণতর সাহিত্যের প্রয়োজন। এতদিনে শিশু বৃহত্তর জগতের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছে, এখন আরো বড় যা, যা বাক্যবহির্ভূত তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, বোঝার আনন্দের সঙ্গে আলোচনার আনন্দ মিলিয়ে নিতে হবে, পাঠ্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চা পাশাপাশি চলবে।

এই স্তবের শিক্ষকতার সব চেয়ে বড় ব্যাপার শিশুকে দিয়ে কাজ করান। আগের স্তরের শিক্ষা খেলার মধ্যে দিয়ে চলত, কিন্তু এখনকার শিক্ষা প্রবুদ্ধ সাহিত্যানুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর প্রেরণার জন্য পাঠ্যবস্তুকে চিত্তাকর্ষক করবার উপায়ও অন্যরূপ। খেলার প্রয়োজন যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নয়, কিন্তু এখন বালক-বালিকার মনে সাহিত্যানুরাগ এতটা উদ্রিক্ত হয়ে যাওয়া উচিত যাতে আপনি তার পাঠে মতি আসে। এখনকার ছাত্রকে সূক্ষ্মানুভূতির দৃঢ়সূত্র দিয়ে লেখাপড়ার কঠিন বন্ধনে বাঁধতে হবে।

এই সময় থেকে বাইরের বই পড়া ছাত্রের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তাই বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং নানাভাবে বাহিরের সাধারণ জ্ঞান আহরণ করবার জন্য তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(৩)

বিদ্যালয়ের উচ্চতম দুইটি শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বলে তাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিরও কিছুটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে

ছাত্রেরা স্বাধীন মতামত পোষণ করতে আরম্ভ করে এবং বাইরের নানা বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই দুটি ভাব সুপরিচালিত হলে যেমন বাঞ্ছনীয়, কুপরিচালিত হলে তেমনই মন্দের আকর হয়ে ওঠে।

ছাত্রদের স্বাধীন মতামত গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমালোচনা করতে শেখে। এই বৃত্তি চিত্তোৎকর্ষের পরিচায়ক, কিন্তু উপযুক্ত অবলম্বন না পেলে নিকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়। যে সমালোচনা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধাবিত হয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে, শিক্ষকের নিয়োগক্ষমতার অভাব ঘটলে সে তাঁকেই অবলম্বন করে, তার ফলে ছাত্র ফাজিল হয়ে ওঠে,---সব জিনিষ নিয়ে তামাসা করে, সকলকে ব্যঙ্গ করে আমোদ পায়।

স্বাধীন মত গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র বহির্জগৎ-সম্বন্ধে সচেতন হয়। আত্মসচেতনতার উন্মেষ প্রথমেই হয়েছিল, এখন জগতের রহস্যময় রূপের চেয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটাই তার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর কাছে যুক্তির প্রয়োজন নাই, পরমসুন্দর চিত্রপরম্পরার মত জগতের দৃশ্যপরম্পরা তার উৎসাহ ও কৌতূহলের উদ্রেক করে, কিন্তু বিচারবুদ্ধি জাগায় না বলে সে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরে যেতে চায় না; কিন্তু বড় হবার সঙ্গে জগতের প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণসম্বন্ধ বুঝবার ও বিচার করবার চেষ্টার ফলে কর্মজগতের সঙ্গে তার কিছু পরিচয় হতে থাকে। বালকের মনুষ্যত্বের বিকাশের দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হলেও এ ভাব বিদ্যালয়ের মধ্যে সঙ্কটের সৃষ্টি করে। বিশেষত আমাদের মত পরাধীন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণ বহু দুঃখবেদনার কারণ হয়ে পড়ে।

এই সময়ে শিক্ষকের কর্তব্য পরম গুরুত্বপূর্ণ। জগৎ ও বিদ্যালযের মিলনের ফলে যে অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হতে পারে তার মধ্যে দিয়ে বহু সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে তাঁকে শিক্ষার্থীরা চালিত করতে হবে।

শিশুর চাঞ্চল্য ও তার মূলীভূত কারণ সমালোচনা-প্রিয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষকসমাজকে এ ক্ষেত্রে অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। দাবী করা তাঁদের অভ্যাসগত হয়ে গেছে বলে মনের মধ্যে একটি আদর্শ স্থাপন করে তদনুযায়ী ব্যবহার ও মতামত ছাত্রসমাজের কাছে তাঁরা আশা করেন; কিন্তু মানুষ কল নয়, কিশোরবয়স্ক বালক শিশু নয়, তাই সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। বহিরাগত শাসনে কোনো ফল হয় না, মনকে আবদ্ধ রাখাই প্রকৃত শাসন।

তা ছাড়া বিচারশক্তির উন্মেষের ফলে ছাত্রের মনেও একটা আদর্শ খাড়া হয়ে যায় এবং তদনুযায়ী সেও চায় যে তার দাবী শিক্ষক পূরণ করবেন, এবং সাধারণত বাংলাশিক্ষার আদর্শ (standard) এত নীচু যে তাতে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির অর্ধমাত্র নিয়োজিত হয়, ক্লাসের পড়ান যদি এমন হত যা বুঝতে তার সমগ্র মনোযোগের প্রয়োজন হত, তা হলে চাঞ্চল্যের অবসর সে পেত না। ইংরিজি বা অন্য কোনো কঠিন বিষয়ের পাঠকালের সঙ্গে বাংলার ঘণ্টায় ছাত্রদের ব্যবহার তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিদ্যালয়ের পাঠের আদর্শের নিম্নতা এর আগের স্তর থেকে কিছু কিছু করে অনুভূত হতে আরম্ভ করে। সেই স্তরেই দেখা যায় যে, বাংলার যথেষ্ট গভীর জ্ঞান শিক্ষক বা পরিদর্শক কেউ দাবী করেন না এবং যে পাঠ নির্দিষ্ট থাকে তার জন্য সাধারণ

বুদ্ধিমান বালকের কিছুমাত্র পরিশ্রম করতে হয় না। এর আগের স্তরে এই কারণে বালক বালিকার অতিসচেতন মন অনেক বিপর্যয় ঘটায় এবং এই স্তরেও ছাত্রেরা পাঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিযুক্ত হয়ে পাঠের সমস্ত সফলতাই হারায়।

বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীর আদর্শের নিম্নতার একটি কারণ এই যে, শেষ দুই শ্রেণীর সমস্ত পাঠই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অভিমুখী হয়ে থাকে বলে পরীক্ষাপ্রশ্নের সম্ভাবনার বাইরের কোনো বিষয় শিক্ষক বা ছাত্র আলোচনা করতে চান না। কিন্তু এই কারণে আদর্শকে হ্রাস করার কোন মানে নেই; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করা সহজ হলেও রীতিমত ভাল করা অত্যন্ত কঠিন:—বিদ্যালয়ের পাঠের আদর্শ উঁচু হলে সেই বিষয়ে সহায়তাই করবে।

অনেকে বলতে পারেন যে, বিদ্যালয়ের পাঠের আদর্শ উঁচু হলে যে সব ছাত্রেরা পড়ায় ভাল নয় তাদের প্রতি অবিচার করা হয়; তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় হয়ত কোনোমতে পাশ করতে পারত কিন্তু বিদ্যালয়ে ফেল হয়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্য কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ এক-সঙ্গে রেখে তারপর ছাত্রদের বুদ্ধির তারতম্যানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ পাঠ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী যদি একই কবিতা প্রবেশিকা থেকে আরম্ভ করে এম.এ. পর্যন্ত সকল পরীক্ষার পাঠ্য-হিসাবে নির্ধারিত হতে পারে, তবে একই শ্রেণীর একই পাঠ্য ছাত্রদের বুদ্ধির তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন আদর্শে পড়ান নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

ছাত্রদের চাঞ্চল্যের আর একটি কারণ বাংলাভাষার প্রতি অবজ্ঞা। বাংলা পড়া সহজ বলে যে এমন হয় তা নয়, সমস্ত

বিদ্যালয়ের আবহাওয়া এর মূলে আছে। যদিও শিক্ষার বাহন-হিসাবে বাংলাভাষার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় প্রধান স্থান পাওয়া উচিত তবু দেখা যায় যে বাংলা ক্লাস ও বাংলা শিক্ষকের সম্মান সব চেয়ে কম। বিদ্যালয় যাকে সম্মান কম দেয় ছাত্ররাও তাকে শ্রদ্ধা করতে চাইবে না, কাজেই বাংলার শিক্ষককে স্বপ্রতিভার দ্বারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হবে। শিক্ষক নিজের উৎসাহ-দ্বারা ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবেন ও নিজের বৈদগ্ধ্য-দ্বারা তাদের বিদ্যানুরাগী করবেন। পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়া বা বাহ্যিক সম্মানলাভের চেয়ে যে বিদ্যানুরাগ বড়, একথাটা বুঝতে পারলে তারা নিজে থেকে বাংলার প্রতি সশ্রদ্ধ হবে ও তার সাধনায় আয়াস স্বীকার করবে।

রাজনৈতিক আন্দোলন যে এই সময়ে বিশেষভাবে ছাত্রদের আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে একথা আগে বলা হয়েছে; এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি দুর্ঘটনা ছাত্রদের ধর্মঘট। এতে সমস্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত দিনের পড়ার ব্যাঘাত হয়, আর উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের উপর বিশেষভাবে উত্তেজনার ঝোঁক পড়ায় অনেক দিন ধরেই তাদের পড়াশুনায় মন থাকে না।

রাজনীতির দিক দিয়ে এর ঔচিত্যের বিচার না করে শিক্ষার দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এতে কতটা ক্ষতি হয়। এতে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যে শুধু একদিনের জন্য ভাঙে তা নয়, এ ছাত্রদের সংযমের গোড়ায় আঘাত করে, ছাত্রদের মন পড়াশুনা থেকে অপসারিত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ধর্মঘট হয়ত ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ক্রমশ এ এমন সংক্রামক ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায় যে, তাদের বিচারবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে অন্ধ অনুকরণের অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, ছাত্রেরা সাধারণভাবে মন্দ বা নির্বুদ্ধি নয়, তারা মোহ এবং উত্তেজনার বশবর্তী ; আর এ কথাও ভুল্লে চলবে না যে, তারা যে দেশপ্রেমের কল্পনায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে তারই সুপথ নির্দেশ করবার ভার শিক্ষকসমাজের। পীড়ন-দ্বারা যে এর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তার প্রমাণ হয়ে গেছে ; তাই নিবারণের অন্য পথ খুঁজতে হবে। যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ছাত্রসমাজকে এই গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে রক্ষা করতে পারে তা শিক্ষকের দেয়।

জ্ঞানের মূল্য তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, এবং জ্ঞানচর্চার অভাবেই যে আমরা জাতি-হিসাবে এত পশ্চাৎপদ এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। জ্ঞানতপস্যার দ্বারা, নানা আবিষ্কারের দ্বারা দেশসেবা যে দেশপ্রেমের প্রধান অঙ্গ তা যেন ওরা উপলব্ধি করতে পারে।

বাংলাভাষা মাতৃভাষা, বাংলাসাহিত্য বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য, তাই বাংলার শিক্ষা সুপরিচালিত হলে তারই উপর জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিপত্তন হবে।

মাতৃভাষা-শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি

কর্মদ্বারা শিক্ষালাভ শিক্ষার স্বাভাবিক পদ্ধতি, কাজ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমের মধ্যে দিয়েই মানুষ সত্যকে অনুভব করে আবিষ্কার করে নেয়। শিশু ছোট বেলায় মাতৃভাষা শেখে শিক্ষকের উপদেশে নয়, নিজের চেষ্টায়। তার চারিদিকে যে বাংলা শব্দের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তার কানে এসে ঠেকে, তারই মধ্যে থেকে তার শব্দসম্পদ গঠিত হয়; চারিদিকে যে বাক্যগুলি উচ্চারিত হচ্ছে তারই অচেতন অনুকরণে সে স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই নিজের বাক্যগুলি গড়ে তোলে। শিশুর বাক্যগঠনে যখন ভুল হয়ে যায় তখন সব সময়ে পিতামাতা যে ভুলটা দেখিয়ে দেন তা নয়, তবু সে নিজের পর্যবেক্ষণ-দ্বারা আপনাকে সংশোধিত করে নেয়, সবাই যেমন কথা বলছে তেমনি ভাবেই কথা বলতে প্ররোচিত হয়।

এইভাবে শিশুর স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার তার মনের উৎকর্ষ সাধন করে ও তাকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষ এই সহজ পদ্ধতিতে নিজের ভ্রম ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানলাভ করে এসেছে। কিন্তু স্কুলে এসেই শিশু একটি নূতন জিনিষের সম্মুখীন হয়, সেটা শিক্ষকের নির্দেশ, এবং এই নির্দেশ যদি সুপরিচালিত না হয়, যদি শিশুর নিজ প্রচেষ্টাকে খর্ব করে ফেলে, তা হলে

শুধু যে তার ভবিষ্যৎ পূর্ণতার বাধাস্বরূপ হয় তা নয়, এই কৃত্রিম নিশ্চেষ্টতা তার বিদ্যালয়জীবনেও বহু দুঃখের কারণস্বরূপ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের অনেক ভাল বিদ্যালয়েই নীচের শ্রেণীতে কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী বা অন্য কোন বিলিতী প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে বলে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিচালনার সুযোগ ঘটে, কিন্তু প্রায় সকল বিদ্যালয়েই উপরের ক্লাসে বালক-বালিকার স্বচেষ্টার চেয়ে গুরূপদেশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলত, শিশু যখন নীচের ক্লাসগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিদ্যাশিক্ষা করতে করতে উপরের ক্লাসে উঠে সহসা এক কৃত্রিম অস্বাভাবিক পদ্ধতির বশবর্তী হয়ে পড়ে তখন তার চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন শিশু হয়ত নীচের শ্রেণীগুলিতে খুব কৃতকার্যতার সঙ্গে পড়াশুনো করত কিন্তু উপরের শ্রেণীতে উঠে তার বুদ্ধি যেন খুলতে চায় না। এমনও দেখা গিয়েছে যে অভিভাবক যখন তাকে কোন সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন তখন তার স্বাভাবিক প্রতিভা আবার ফিরে এল। এর কারণ এই যে বিলিতী প্রথায় পরিচালিত ইস্কুলগুলোয় নীচে থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সবটা শিক্ষারই ভিত্তি শিশুর স্বাধীনচিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা।

শিশুর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ধারার একটা স্বাভাবিক ক্রম আছে। নীচের শ্রেণীর শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বস্তুর উপর নির্ভরশীল; বস্তু থেকে বাক্যে এবং বাক্য থেকে বস্তুতে যাতায়াত করে শিশু মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি করে শিক্ষা পায়। কিন্তু সব সময়ে

বস্তু উপস্থিত করা সম্ভব হয় না এবং বস্তুর প্রয়োজনও সকল ক্ষেত্রে থাকে না, তখন চিত্র, মানচিত্র, মডেল, নক্সা, ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ প্রভৃতি বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। ঠিক এই ভাবেই উদাহরণের দ্বারা নক্সার সাহায্যে বালকের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ শক্তির সহায়তায় বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা চলতে পারে। বিজ্ঞানের ক্লাসে যেমন পরীক্ষার (demonstrations) দরকার তেমনি সাহিত্যের ক্লাসেও প্রত্যক্ষ ও প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

বাংলা শেখাবার সময়ে আগে চাই বাস্তবের জ্ঞান, অক্ষর-পরিচয় ধীরে ধীরে আসবে। শক্তিকে মার্জিত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় অভ্যাসের ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের দ্বারা। পড়াশুনায় আনন্দ ও উৎসাহই প্রধান উপাদান তাই কাজ ও উৎসাহ আগে আসে, তারপর পাঠ ও ব্যাখ্যা।

ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া অন্যান্য বিষয়ের মত ভাষাশিক্ষারও প্রাথমিক নিযম। শিশু কানে শুনে ভাষা আয়ত্ত করে তাই যে কালা সে বোবাও হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষাও এই স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে হওয়া চাই, ফলত শিশুর প্রথম পাঠ শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, গল্প করা। এই সময়ে শুধু তার কান নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও জাগ্রত করে তাদের সহায়তায় শিক্ষাকে উজ্জ্বল করতে হবে। শিশুকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য উজ্জ্বলরঙের ছবি দেখাতে হবে, তাছাড়া তাকে নানারকম জিনিষ বা জিনিষের মডেল এনে দিতে হবে, যাতে নিজে স্পর্শ করে, মেপে তুলনা করে তার ধারণাসমূহ বিশদ হয়। বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না হলে শিশু কিছুতেই পরিষ্কারভাবে, প্রাঞ্জল ভাষায় তার বর্ণনা করতে

পারবে না। বোর্ডের ব্যবহারও নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষত শিক্ষক যদি ছবি আঁকতে পারেন তবে তাঁর হস্তচালনার পদ্ধতি দেখতে পেলে শিশুর শিক্ষা পূর্ণতর হবে। পড়া ও লেখার আগে যেন শিশু ছবি এঁকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

সর্ববৃত্তির উন্মেষ ও মার্জনার চেষ্টার বিকাশ হয় কর্মশীলতার মধ্যে দিয়ে। শিশুকে যদি সব জিনিষই নিজে দেখে শুনে, মেপে, তুলনা করে, ব্যবহার করে শিখতে হয় তবে তার শিক্ষা হবে অখণ্ড কর্মস্রোতের মধ্যে দিযে (learning by doing), শান্ত ছেলেব মত বেঞ্চিতে বসে বই পড়ে নয়। কাজেব মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাই প্রকৃত শিক্ষা, সেইজন্য আসল কর্তা হবে শিশু, শিক্ষক হবেন নিমিত্ত মাত্র। সে যেন তার নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অনুভূতির দ্বারা পাঠ্যবিষয় বুঝে নিতে পারে, শিক্ষক কেবল পথপ্রদর্শন কববেন। কলেজেব অধ্যাপনায আব ইস্কুলেব শিক্ষকতায তাই এত প্রভেদ।

শিশুকে যদি নিজেব চেষ্টা ও বুদ্ধিদ্বারা বিদ্যাকে আযত্ত করতে হয তাহলে তার শিক্ষার ভিত্তি পরিচিতস্থলে স্থাপিত কবতে হবে তবেই শিশু ধীরে ধীরে অনুসন্ধানেব দ্বারা অজ্ঞাতকে আবিষ্কার করে নিতে পারবে। এইজন্য বস্তু থেকে তার শিক্ষা সুরু হবে। রোজ যে জিনিষ সে দেখে থাকে তারই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে সে আস্তে আস্তে অজানার রাজ্যে ও ভাবজগতে বিচরণ করতে শিখবে। তার গতি হবে জানা থেকে অজানায়, বস্তু থেকে ভাবে।

শিশুর শিক্ষা হবে আরোহপদ্ধতিতে (Inductive method)। পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যসকলের কথা শুধু বসে বসে শুনলে তার চলবেনা, নিজের চেষ্টায় সেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তার সামনে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারলে সে শিক্ষকের সামান্য সহায়তায়ই অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়মসমূহ বার করতে পারবে। সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে নিশ্চেষ্ট করে রাখলে সে তোতাপাখীর মত পরের বুলি আওড়াতে আওড়াতে অনুকরণশীল হয়ে পড়বে, যে বুদ্ধি মানুষকে নব নব আবিষ্কার ও উন্নতির পথে প্রণোদিত করে সেই বুদ্ধি তার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

শিশুকে উদ্যমে প্রবৃত্ত করতে হলে তার পডাশুনাকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে। শিশুর মধ্যে কল্পনাপ্রবণতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এত প্রবল যে শাসনদ্বারা তাকে প্রতিহতই করা যায়, আকৃষ্ট করা যায় না। কাজেই তার যাতে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ আসে, যাতে পড়তে পড়তে সে বিরক্ত না হয়ে পড়ে তাই খেলাচলে পড়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। অবসাদগ্রস্ত (bored) মন নিয়ে পড়লে সেই পড়ায় কোন লাভ হয়না তাই মন্তেসরা পদ্ধতির নিয়ম এই যে শিশুকে রুটিনের বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ করা চলবে না, শিক্ষার সমুদয় যন্ত্রপাতিতে তার চারিদিক ঘিরে রাখতে হবে, সেগুলিকে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করে শিক্ষকের সাহায্যে সে বিদ্যা আয়ত্ত করবে। এইজন্য নিম্নশ্রেণীতে খেলার মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতির (playway) প্রচলন হয়েছে এবং উচ্চশ্রেণীতেও চিত্র, অভিনয়, আলোচনা, প্রভৃতিদ্বারা পড়াকে চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতি শিশুকে যেমন আনন্দ ও কর্মের অধিকারী করে অঙ্কুরিত করেছিল মানুষ তাকে তেমনি করেই বিকশিত করবে।

শিশুদের খেলার মধ্যে দিয়ে পড়ার যে সব পদ্ধতি প্রচলিত

আছে সেগুলির সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে বহুবিধ ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়া একে সফল করা যায় না। যে সকল সরঞ্জাম অনেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসম্মত হলেও এবং তাদের শরীর ও মনের বিকাশের উপযোগিতা থাকলেও প্রত্যক্ষশিক্ষার আসল উপাদান শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। তাছাড়া যে সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজনীয় বলে বলা হয়েছে, বই দেখে নক্সা করে সহজেই তার অনুরূপ জিনিষ তৈরী করিয়ে নেওয়া যায়। অনেক সময়ে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির দ্বারাও তার কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

ভাষাশিক্ষার প্রথম অবস্থায় উজ্জ্বল, রঙিন জিনিষ, ছবি, ব্ল্যাকবোর্ড, শিক্ষকের কথাবার্তাই প্রধান উপাদান। বইয়ের দরকার নেই, তবে শিক্ষক প্রয়োজন বোধ করলে নিজের সুবিধার জন্য বই রাখতে পারেন।

অভিনয়ও শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ। যা অন্য কোন রকমে শিশুর প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হতে পারেনা অভিনয়ের দ্বারা সেটা তার কাছে প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কবিতা, গল্প, দেশবিদেশের জীবনযাত্রার বর্ণনার অভিনয় করার সার্থকতা খুব বেশী। অভিনয়ের সঙ্গে যদি কিছু পোষাকপরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জাম রাখা যায় তবে শিশুর আনন্দের সীমাপরিসীমা থাকবেনা, এবং সে যা শিখবে তা তার মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে থাকবে।

নীচু কানাওয়ালা বাক্সে বালি ঢেলে (Sand tray) তার উপর ছোট ছোট খেলনা বা মডেল সাজিয়ে শিশুকে দেখালে ছবির চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে শিশুর মনে প্রতিভাত হবে।

উপরের নিয়মগুলি যে-কোন বিষয়েব শিক্ষায়ই প্রযোজ্য, তবে মাতৃভাষার শিক্ষাপদ্ধতিব কিছু বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানবৃদ্ধি ও বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন কিন্তু ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যেই নিহিত, কারণ ভাষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি। কেবলমাত্র সৎপ্রণালীই শিক্ষাবিষয়কে অবলম্বন করে সম্যকভাবে শিশুমনোবৃত্তির উন্মেষ করতে পাবে বলে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষায় তথ্যগুলি অপেক্ষা পদ্ধতিই প্রধান; কিন্তু মাতৃভাষার শিক্ষায বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি দুয়েরই সমান প্রাধান্য; কেননা ভাষা মনোবৃত্তির উন্মেষেব যন্ত্রমাত্র নয়, শিশুর বিকশিত মনের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য এর প্রতি অঙ্গের উপর তার আধিপত্য চাই। বাংলাভাষাশিক্ষা বাঙালী শিশুর আদি ও প্রধান শিক্ষা; অন্যবিষয়ের শিক্ষার ভূমি বাংলা তাই ভাষাযন্ত্র অধিকাব করতে না পারলে কোন শিক্ষাবই পূর্ণতালাভ হয় না; বুঝতে না পাবাব দোষের চেয়ে অধীত বিষয় প্রকাশ কবতে না পারাটাই শিশুব দুর্বলতার কারণ হতে বেশী দেখা যায়।

শব্দ শিশুর ভাষাশিক্ষার মূল। সে প্রত্যহ যা করে, যা দেখে বা যার ব্যবহার করে, প্রত্যেক কাজ বা জিনিষের দ্যোতক শব্দ আছে, সেই শব্দসমূহই শিশুব ভাষার প্রথম সম্পদ। এর স্ফূর্তি বাক্যবিন্যাস ও কথোপকথনে এবং তাকে ভিত্তি করেই তার শিক্ষার আরম্ভ হয়। ঘরে, বিদ্যালয়ে এবং ঘর ও বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী পথে শিশু যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসে, যে-সকল কাজ বা খেলায় ব্যাপৃত থাকে তাকে ভিত্তি করে আলোচনা করতে করতে ক্রমশ নূতনতর অভিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে অজানার রাজ্যের পথপ্রদর্শন করতে হবে। শিশু বাড়ীতে কি দিয়ে ভাত খায় সেই থেকে আরম্ভ করে বিদ্যালয়েব যে যে বন্ধুবান্ধব তার

প্রিয় বা আকাশে যে এরোপ্লেন সে উড়তে দেখল সমস্তই তার আলোচনার বিষয়ীভূত হবে। এতে শুধু যে জানার উপর অজানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল তা নয়, এর দ্বারা শিশুর ঘর, বিদ্যালয় ও বহির্জগত একসূত্রে গ্রথিত হল (correlation)।

এই মিলটা সকল শিক্ষার আসল কথা, এটা যে লাভ করল না তার জীবনে শিক্ষা অর্থোপার্জনের উপায়মাত্র হয়ে রইল এবং তার সমগ্র শরীর মন, গৃহসংসার শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকল। সে হয়ত সাংসারিক দিক থেকে বড়লোক হতে পারবে কিন্তু তার অন্তরের পণ্ডিতমূর্খটি প্রতিপদে অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেবে।

ভাষাশিক্ষার শাখাপ্রশাখা

জীবনের প্রতি মুহূর্তেই মানুষের পক্ষে ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য; প্রত্যেক কর্ম, চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র প্রকাশের ভাষাই একমাত্র বাহন। তাছাড়া পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য, মানবের পরস্পরের সঙ্গে যোগসাধনের জন্য, সাহিত্য-রসোপভোগের আনন্দ লাভ করবার জন্য ভাষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষার সংসর্গ ও প্রয়োজন মানবজীবনে এত নিবিড়, গভীর এবং ব্যাপক বলে ভাষাশিক্ষাও আমাদের তেমনই বিস্তৃত এবং নিগূঢ় হওয়া চাই।

মানুষ কথার সাহায্যে পরস্পরকে নিজের প্রয়োজন বোঝায় এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ভালবাসা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি সকল ভাব জানায়; ধূর্তব্যক্তি ভাষার ছটায় ভুলিয়ে লোককে পরিচালিত করতে পারে; ভাষার দ্বারা বাগ্মিগণ বিরাট জনতা আন্দোলিত করেন।

বলতে শেখা তাই শিশুশিক্ষার অঙ্গ। শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে আসে তখন সে ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না তাই শিক্ষককে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, তাকে নিজের প্রযোজনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহিত করে, এমন করে গুছিয়ে কথা বলতে শেখাতে হবে যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। প্রাঞ্জলভাবে নিজের ভাব অন্যকে বোঝাতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক ভুলবোঝার দুঃখের হাত সে এড়াতে পারবে। তারপর শিশুকে শুধু পরিষ্কার করে,

বিশদভাবে নয়, এমন ভাবে কথা বলতে শেখাতে হবে যাতে তাব কথা অপরকে প্রভাবিত কবতে পাবে। সে শক্তি সে বিত্যালয়েই আযত্ত কববে, শুধু ক্লাসের কথাবার্তায় নয়, বক্তৃতা, তর্ক, আলোচনা ইত্যাদিব মধ্য দিযে। শব্দের মধ্য দিযে মনেব ভাব প্রকাশ কববাব ক্ষমতা যাতে তাব হয শিক্ষক সে ব্যবস্থাও কববেন। অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদিব দ্বাবা সুসাহিত্যেব সুন্দব ভাষা ফুটিযে তুলবাব অভ্যাস হলে সে নিজেব বক্তব্যও সুন্দব ভাষায, উজ্জ্বলভাবে বলতে পারবে। কোন শিশুর মধ্যে যদি বাক্‌প্রতিভা নিহিত থাকে তবে বাগ্মীটিকে গড়ে তুলবাব ভাব যেন বিত্যালযই নিতে পাবে।

মানুষ শুধু কথা বলে না, লেখাপড়া কবে, তাই শিশু পড়তে শিখবে কেবল নিবক্ষবতা দূবীকবণের জন্য নয, মানুষেব সঙ্গে ভাবযোগসাধনের জন্য, গভীব সাহিত্যবস উপলব্ধি কববাব জন্য। পড়তে শেখাব প্রথম প্রযোজনীযতা কর্মবহুল জগতে বাঁচবাব জন্য, কাজেব কথা পড়ে বুঝবার জন্য। সেইজন্য শিশুকে তাব পড়াব মধ্য দিযে জীবনেব ব্যবহাবেব সঙ্গে পবিচিত কবে দিতে হবে। সাহিত্যবস শিশু অতি অল্পবযস থেকে উপভোগ কবতে পাবে; যখন থেকে সে ছেলেভুলোনো ছড়া আব ছোট ছোট গল্প পড়তে শিখবে তখন থেকেই সাহিত্যেব সঙ্গে তার পবিচয। এখান থেকে ক্রমশ তাকে উদারতব সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিতে হবে যাতে তাব আনন্দ ও 'ব্রহ্মাস্বাদ' দুইই ঘটে। তাবপর সাহিত্য শিক্ষিতমনেব যে মিলনসাধন কবে তাব মূল্য বড় কম নয। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ কবে বলেছিলেন আমবা এতখানি পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত যে শিক্ষিত বাঙালীব শিক্ষিত ইংরেজেব সঙ্গে যতটা মিল আছে অশিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে তার একাংশও নাই।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালীদের মধ্যে সেই অন্তরঙ্গতা স্থাপিত করতে হবে, দেশের সঙ্গে দেশবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত দেশবাসীর মিলনসাধন করতে হবে, তাদের দেশকে চিনতে শেখাতে হবে।

শিশু প্রথম যখন পড়তে শেখে তখন ছড়া গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দে পাঠের পাথেয় সঞ্চয় করে ক্রমশ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেতে থাকে, তখন সে দেশের ও জগতের নানা তথ্য আহরণ করতে ও ভবিষ্যতের কর্মজীবনের একটা ধারণা করতে পারে। এইজন্য সাহিত্য-পাঠের প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়। কিন্তু সাধারণত বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে এবং যতটুকু সাহিত্যপাঠ হয় তার সাহায্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন, এইজন্য বিশেষ করে সাহিত্যোপভোগের পাঠ দরকার এবং ছাত্রেরা বিদ্যালয়েও পুস্তকাগারের গ্রন্থাবলী যাতে স্বেচ্ছায় উপভোগ করতে পারে সেই শিক্ষাও তাদের দেওয়া চাই। বিদ্যালয়ে সাহিত্যালোচনার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে নিবিড় সঙ্গ স্থাপন করে দিতে পারলে ভবিষ্যৎজীবনের মিলনের সোপান-স্বরূপ হবে। এই সমিতিতে ছাত্রেরা যে শুধু সাহিত্যের সমালোচনা করবে তা নয়, সাহিত্যপাঠ তাদের সাহিত্যালোচনার অঙ্গ হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সৃষ্টি একসঙ্গে উপভোগ করতে পারলে তাদের সাহচর্য আরো নিবিড় হয়ে উঠবে।

পড়ার মত লেখাকেও আনন্দ, ব্যবহার ও উপভোগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ও সৃষ্টির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে হবে। প্রথম লিখবার সময়ে আনন্দ না পেলে লিখতে শেখাই শিশুর পক্ষে কঠিন হবে; তাই যা তার ভাল লাগে সেই সব বিষয়-অবলম্বনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লেখার দ্বারা তার লেখার শক্তি

গঠিত হলে তবে ক্রমশ ব্যবহার-বিশুদ্ধিরও অভ্যাস করাতে হবে। ব্যাকরণ সে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই শিখবে আর ব্যবহার শিখবে সত্যকার ব্যবহারের অনুকরণ-দ্বারা। এই খেলায় আনন্দের সঙ্গে কাজের সমন্বয় ঘটবে। খেলার ছলে ডাকঘর, দোকান ইত্যাদি স্থাপন করে তার কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধে শিশু শিক্ষালাভ করবে, বেচাকেনা এবং কাজকর্ম-সম্বন্ধীয় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গুছিয়ে কথাবলার অভ্যাস হবে, লেবেল, টিকিট, বিল, তালিকা, বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ডগুলি পড়তে পড়তে পড়ার অভ্যাস হবে এবং সেগুলি যারা লিখবে তাদের লেখারও অভ্যাস হবে। ডাকঘরে দেবার জন্য এবং দোকানের কাজের সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি লিখেও রচনাশক্তি বাড়বে। এই সব কাজ (Projects) তাই একাধারে জ্ঞানবৃদ্ধি, ভাষাশিক্ষা, জাগতিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা দান করবে। এর সঙ্গে ছাত্রেরা যদি মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহ পায় অথবা হাতে লেখা খবরের কাগজ (cf wall newspapers) চালাবার অনুমতি পায় তাহলে বৃহত্তর কর্মজগতের সঙ্গে তাদের যোগ নিবিড়তর হয়ে উঠবে। শিশু চিরকালের স্রষ্টা, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যে অদম্য; এ চেষ্টা যেন আদৃত ও সম্মানিত হয় শিক্ষককে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দু'একটি কবি ও সাহিত্যিকের অঙ্কুর থাকতে পারে, বিদ্যালয়ের মাসিক পত্রিকায় বা অন্য অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রকাশের দ্বারা তাদের সৃষ্টি-প্রেরণা যেন উৎসাহিত হয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের 'হরিণবাটি' থেকে পালিয়ে সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করার গৌরব যেন বিদ্যালয়ই পেতে পারে।

এই ভাবে লেখাপড়া, কথাবলার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, ভাগে ভাগে সাহিত্য-পরিচয় ও সাহিত্যশিক্ষা ঘটে থাকে। এর বহু অঙ্গ; কথা বলতে, বাক্‌বিন্যাস করতে, তর্ক ও বক্তৃতা করতে, অভিনয় ও আবৃত্তি করতে শিখে শিশু ভাষার মৌলিক ব্যবহাব আয়ত্ত করবে; অক্ষর এবং শব্দ ও বাক্যের পাঠ শিখে সে পডতে শিখবে; সেই পাঠও ধরে ধরে, ঠেকে ঠেকে, ক্রমে সাবলীল, অনাযাস পাঠে উত্তীর্ণ হয়ে তবে কঠিনতর পাঠের দিকে অগ্রসর হবে। লেখার ব্যাপারেও তাই। প্রথমে খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দের সঙ্গে ছোট ছোট বাক্য লিখতে শেখাতে হবে, তারপর ক্রমে শিশুকে সেই বাক্যগুলি থেকে অনুচ্ছেদে ও অনুচ্ছেদ থেকে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ ও গল্পে উত্তীর্ণ হতে হবে। এর আয়োজনও চাই,—কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক, বক্তৃতা, অভিনয, বই পডা, ব্যাখ্যা করা, পড়া দেওযা, ব্যাকরণ-শিক্ষা, অনুবাদ, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-সাগব পার হয়ে তবে বালকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে।

এর মধ্যে বহু অপচেষ্টা ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ রয়েছে; বহু অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, বহু আবশ্যককে খর্ব করা হয়েছে; বাহিরের ব্যবহারিক, রাষ্ট্রিক, অর্থ ও বাজনৈতিক নানা কারণবশত বহুক্ষেত্রে মনোবিকাশের সত্যকে খব করা হয়েছে, আদর্শকে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করা হয়েছে; বহু ক্ষেত্রে প্রাচীনের প্রতি অনাবশ্যক মোহ ও নূতনকে গ্রহণ করায় কুণ্ঠার ফলে সুপদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে; এই সবের মধ্য দিয়ে শিক্ষাতরীর পরিচালনা করতে হবে, বাস্তবের সমস্ত তুচ্ছতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জয় করে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুখের পড়া

বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে যে সব শিশু ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অনেকের বর্ণপরিচয় থাকা তো দূরের কথা বিশুদ্ধভাবে কথাবলার ক্ষমতাও গড়ে উঠে না ; এই সময়ের সমস্ত শিক্ষা তাই শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে হয়।

গল্প বলা কথাবার্তার অঙ্গ। গল্প শিশুকে যেমনভাবে মুগ্ধ করে আকর্ষণ করে তেমন আর কিছুই নয়। পরীর গল্প সর্বদাই ছোট শিশুর প্রিয়, এগুলির বিরুদ্ধে কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ যে আপত্তি করেছিলেন তাও খণ্ডিত হয়ে গেছে ; কাজেই সবচেয়ে ছোট শিশুদের সাধারণত নানা রকম পরীর গল্পই বলা হয়ে থাকে ; এ ছাড়া এরা শিশুজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গল্পও খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনবে, আবার কোন কোন শিশু গাড়ীঘোড়া, কলকব্জার প্রতি ছোটবেলা থেকেই ঔৎসুক্য দেখাবে। এইসব প্রয়োজনের উপযোগী গল্প সংগ্রহ করার ভার শিক্ষকের উপরে, তিনি যেন সবরকমের গল্পের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন যাতে শিশুচিত্তের সবরকম ভাবই সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। এ ছাড়া জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঈসপের গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ থেকে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায় যাতে জীবজন্তু, গাছপালা, জিনিষপত্র প্রভৃতিকে নায়করূপে কল্পনা করা হয়েছে, এগুলিও শিশুদের খুব প্রিয় হয়।

ক্রমশ শিশুর সামনে একদিক দিয়ে যেমন দেশবিদেশের নানা রূপকথার ভাণ্ডার খুলে যাবে তেমনি অপরদিকে ইস্কুলের গল্প, গাহস্থ্যজীবনের গল্প সে উপভোগ করতে আরম্ভ করবে। এই সময় থেকে সাধারণত গল্প বলা ও গল্প শোনার কাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন গল্প পড়তেই তার বেশী ভাল লাগে; তবে গল্পের ছলে দেশবিদেশের অথবা সাহিত্য-ইতিহাসের নানা কথা শুনতে সে চিরকালই ভালবাসবে।

গল্প ছাড়া সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে দিয়েও বাইরের অনেক জ্ঞান শিশুকে দান করা যায়। পড়তে শিখবার আগে তো নিশ্চয়ই, পরেও কথার ছলেই তার শিক্ষার অনেকখানি হওয়া উচিত, কেননা যখন শিশু অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কয়েক ছত্র পড়তে পারে মাত্র তখন বইকেই তার জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ করলে সে পথ তার কাছে একরকম রুদ্ধই থাকবে। শুধু নীচের এবং নিম্নমধ্য শ্রেণীর কেন, উপরের ক্লাসের ছেলেদের কাছেও অধীত বিদ্যার চেয়ে শ্রুত বিদ্যা সহজায়ত্ত ও অধিক চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়।

অনেক ইংরিজি বিদ্যালয়ে নীচের শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে অনেক উপরের শ্রেণী পর্যন্ত নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিপরিচয় ইত্যাদির কথা মুখে মুখেই শোনান হয়; এবং একথাও সত্য যে শিক্ষক যদি যথেষ্ট সুন্দর চিত্রাদির সাহায্যে এবং সুন্দর ভঙ্গিতে শিক্ষা দিতে পারেন তবে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা অধীত বইয়ের শিক্ষার চেয়ে অধিকতর ফলপ্রদ হবে। এই ধরণের বিদ্যালয়ে অনেক উপরের শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট পুস্তক থাকে না, ছাত্রেরা নিজেদের শোনা কথা নোট করে, বাইরের বই পড়ে,

ছবি ও ম্যাপ এঁকে অথবা সংগ্রহ করে নিজেদের বই তৈরী করে নেয়। এমন কি অনেক ইংরিজি বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময়ে পাছে ছাত্র বেশী পড়ে এইজন্য পাঠ্যপুস্তক বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না।

এর ফলে এই ছেলেগুলি সাধারণত আমাদের মত গ্রন্থকীট হয় না, আমাদের মত বইয়ের কথাকে সবস্ব মনে করে পরীক্ষা দিতে যায় না, নানাপ্রকার সমীক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনে অভ্যস্ত বলে প্রমাণের যাচাইয়ের অপেক্ষা এরা রাখে। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে ক্লাসের পড়ার উপর গভীরভাবে নির্ভর করতে হয় বলে ক্লাসের পড়া মন দিয়ে শুনে চটপট বুঝে নেওয়ার অভ্যাস হয়; অন্যথা ছাত্র যদি জানে যে সে ক্লাসের পড়ায় যতই ফাঁকি দিক না কেন শেষমুহূর্তে কয়েকটা পৃষ্ঠা কণ্ঠস্থ করে নিলেই হবে, তাহলে শুধু যে তার শিক্ষা দোষপূর্ণ থেকে যাবে তা নয় বিদ্যালয়ের পাঠের উপর তার শ্রদ্ধাও কমে যাবে।

কানে শুনে শেখার পদ্ধতি বালস্বভাব-সম্মত। বইয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করা অল্পবয়সের রীতি নয়। বালক তার সমস্ত শরীর মনকে কাজে নিযুক্ত করে যদি জ্ঞানলাভ করতে পারে সেই জ্ঞানই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।

মৌখিক শিক্ষার দুটো দিক, শোনা এবং বলা, আদান এবং প্রদান। কথাবলার যে অভ্যাস মৌখিক পরীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা করান হয় সেটার মূল্য ছাত্রের ভবিষ্যৎজীবনে খুব বেশী। জীবিকা-উপার্জনের সম্পর্ক ব্যতীত এবং চিঠিপত্র লেখার কাজ ব্যতীত অধিকাংশ বয়স্ক লোক লেখার কাজ করেন না, তাঁদের জীবনের অধিকাংশ ভাবের আদানপ্রদান ইত্যাদি মুখের কথার দ্বারাই চলে থাকে। কর্মজীবনে প্রবেশ করার মুখেও অনেক

ক্ষেত্রেই মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এইসব কারণে ছাত্রদের গুছিয়ে, সপ্রতিভভাবে কথাবলার অভ্যাস করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা পঠিত বিষয়ের জ্ঞানের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কথাবলার সপ্রতিভ ভঙ্গিরও পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীর পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে মৌখিক, এবং তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী অবধি কিছুটা লিখে ও কিছুটা মুখে মুখে পরীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু উপরের শ্রেণীতে একেবারেই নেই। এ নিয়ম বড হানিকর; জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিলেও ছাত্রদের যখন কর্মজীবনে পা দেবার মুখে মৌখিক পরীক্ষা দিতেই হবে তখন এই কারণেও অন্তত বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন থাকার দরকার।

পরীক্ষা ভিন্নও নানারকমের অভ্যাসের দ্বারা ছাত্রের কথাবলার শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। আবৃত্তি তার মধ্যে একটি। খুব নীচের শ্রেণীতে যখন শিশুরা ছড়ার আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে তখন থেকে উঁচু ক্লাসের বড বড় কবিতার আবৃত্তি পর্যন্ত একই শক্তির ক্রমবিকাশ দেখা যায়। আবৃত্তিতে শিশুর মৌলিক রচনার সুযোগ নেই বলে কেউ কেউ হয়ত তাকে মৌখিক কাজের মধ্যে ধরতে চাইবেন না, কিন্তু এতে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি আয়ত্ত হয়ে যায় বলে একে আমরা গ্রহণ করব। ইংরিজিতে যেমন আবৃত্তির উপযোগী কবিতার সংগ্রহ-পুস্তক পাওয়া যায় বাংলাতে তেমন গ্রন্থ বেশী না থাকলেও অনেক শিশুপাঠ্য কবিতার বই থেকে কবিতা বেছে নিয়ে ব্যবহার করা যায়, ছোটদের পত্রিকাতেও আবৃত্তির উপযোগী কবিতা

প্রকাশিত হয় এবং অনেক বড় কবির সাধারণ কবিতাও শিশু এবং বালকেরা আবৃত্তি করতে পারে। এই উপলক্ষ্যে ছাত্রদের স্বয়ং-সঞ্চয়ন সম্বন্ধেও উৎসাহিত করা যায়।

কবিতা মুখস্থ করবার যে পদ্ধতি সাধারণভাবে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত আছে সে পদ্ধতি ভ্রমাত্মক বলে ছাত্রেরা মুখস্থ করা ব্যাপারটাকেই ভয়ের চোখে দেখে থাকে। সাধারণত কবিতার একেকটি ছত্র নিয়ে বহুবার উচ্চারণ করে, একেক ছত্র করে মুখস্থ করা হয়ে থাকে, কিন্তু মুখস্থ করার প্রকৃত পন্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কবিতা মুখস্থ করার আগে সম্পূর্ণ কবিতাটির অর্থ বুঝে সম্পূর্ণ কবিতাটিকে বার বার পড়ে আয়ত্ত করতে হয়। কবিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিলে মুখস্থ করা সহজ তো হয়ই না বরংচ ভ্রমের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে যায়। উপরি-উক্ত পদ্ধতির উপকারিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ কলিকাতাস্থ দু'একটি বিদ্যালয়ের নাম করা যায় যেখানকার ছাত্রেরা এই পদ্ধতিতে কবিতা মুখস্থ করে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে যে-কোন কবিতা কয়েকবার সম্পূর্ণভাবে পড়লেই তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

আবৃত্তি ও অভিনয়ের সম্পর্ক অতি নিকট। আবৃত্তিব সময়ে ভাবপ্রকাশের যে-সমস্ত পন্থা (actions) অবলম্বন করা হয় সেগুলি অভিনয়ধর্মী। আবৃত্তির মত অভিনয়ও শিশুশ্রেণীর প্রথম থেকেই চলতে পারে। যে অতি ক্ষুদ্র শিশু ড্রাইভার, পুলিশ, সিপাই ইত্যাদি সেজে নিজের কল্পনার উৎস খুলে দেয়, সেই যে শৃগাল সেজে দ্রাক্ষাফলের জন্য লাফাতে বা মৌমাছি সেজে নেচে নেচে মধুর সন্ধানে যেতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু কবিতা বা নাটিকার অভিনয় নয়, শিশুশিক্ষার

প্রায় সকল পাঠকেই শিশুরা নিজেরাই তাদের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকায় রূপান্তরিত করতে পারে। এতে শিশুর পাঠ্য বুঝবার সহায়তা করে এবং সাহিত্যরচনা ও অভিনয় দুই কাজ একত্রিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বনের কুকুর ও গৃহের কুকুব অথবা মৃণ্ময় কলসী ও পিতলের কলসীর গল্প নেওয়া যেতে পারে। পাঠ্য-পুস্তকে প্রথমে শিশু এই দুইয়ের কথোপকথনের কথা পড়ল ; তারপর পুনবালোচনার সময়ে শিক্ষক শিশুদের প্রশ্ন করে কবে তাদের কাছ থেকে, তাদের ভাষায়, সেই কথোপকথনের কথাগুলি জেনে নিয়ে নাটিকাকারে বোর্ডে লিখিয়ে দিতে পারেন। এরপর পাত্রনির্বাচন। দুটি (বা অন্য কোন গল্প হলে ততোধিক ` শিশুকে অভিনয় করবার ভার দেওয়া হল, অন্যরা শুনবে এবং সমালোচনা করবে। প্রথম অভিনয় হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিয়ে অপর দুটি শিশুকে পুনরভিনয়ের জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। এতক্ষণে কথাগুলি তাদেব মুখস্থ না হয়ে যাক অন্তত এতটা অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে সেগুলি সামনে বোর্ডে লেখা না থাকলেও তারা চটপট অনুরূপ কথাবার্তা রচনা করে নিতে পারবে। অভিনয় যদি বেশী বার করান হয় তবে প্রতিবারে তার মধ্যে পাত্রদের কিছু মৌলিক দান থাকা চাই। দর্শকেরা প্রত্যেকবার নাটক ও অভিনয়-সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জানিয়ে সমালোচনা করবে। সর্বশেষে সকলের মিলিত চেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফলটি ছাত্রেরা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য পরিপূর্ণ নাটকের আকারে খাতায় লিখে রাখতে পারে।

উপরের ক্লাসে এরূপ অভিনয় হয়ত সবসময়ে ছাত্রদের মনঃপূত হবে না, কেননা এদের অভিনয়-সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা আরো

উঁচু; এরা এখন সত্যকার নাটকের অভিনয় করতে চাইবে। তাছাড়া, কোন কাব্য বা কাহিনী থেকে তাদের দ্বারা নাটক রচনা করিয়ে, ক্লাসে তার অভ্যাস করবার পর কোন ছুটির দিনে পরিপূর্ণ অভিনয়ের সুযোগ দিলে তারা আনন্দিত হবে।

গল্প বলা মৌখিক কাজের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথম প্রথম শিক্ষক গল্প বলবেন, শিশুরা শুনবে, তারপর ক্রমশ শিশুদেরও গল্প বলতে শেখাতে হবে। শিশুব প্রথম কথা পূর্ণবাক্যরূপ ধারণ করে না, শব্দই তখন তার প্রধান উপজীব্য, তারপর ক্রমশ সে বাক্যভঙ্গি আয়ত্ত করে। যখন সে বিদ্যালয়ে আসে তখনও সম্পূর্ণ বাক্য বলার চেয়ে দু'এক কথায় কাজ সারবার ইচ্ছাই তার প্রবল থাকে। শিক্ষকেব সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার সম্পূর্ণ বাক্যগঠনের অভ্যাস পাকা হলে তাকে বাক্যপরম্পরা রচনা করতে শেখাতে হবে। ছবি দেখিয়ে গল্প বলান এর খুব ভাল উপায়; যেমন একটা ছবি দেখান হল, যাতে একটি ছোট্ট মেয়ে আধখানা জিলিপি হাতে নিয়ে একটি পুতুল কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিব বর্ণনা করতে বল্লে শিশুর নীরস লাগবে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত গল্পটি টেনে আনতে পারলে সে খুব আগ্রহান্বিত হবে। "একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে আধখানা জিলিপি আছে। তার কোলে একটা পুতুল আছে। তার পুতুলের জামা নীল। তার শাড়ীর রং লাল।" ইত্যাদি যা যা শিশু দেখতেই পাচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি না করিয়ে যদি নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তার কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া যায় তবেই ব্যাপারটা তাদের কাছে সরস হবে।

খুকুকে পুতুলটা কে দিয়েছে?—তার মা দিয়েছে।

কেন দিয়েছে?—খুকু খুব লক্ষ্মী হয়ে পড়াশুনা করেছিল বলে দিয়েছে।

খুকু জিলিপি নিয়ে কি করছে?—খাচ্ছে।

শুধু একলা একলা খাচ্ছে কি?—না পুতুলকেও খাওয়াচ্ছে।

খুকুর জিলিপি খেতে কেমন লাগে?—খুব ভাল লাগে।

খুকুর পুতুলের নাম কি?—সোনা।

তাহলে গল্পটাকে শেষপর্যন্ত এই রকম দাঁড় করান যায়—"খুকু খুব লক্ষ্মী হয়ে পড়াশুনা করেছিল তাই তার মা তাকে একটা পুতুল দিয়েছিলেন। সে তার পুতুলের নাম দিয়েছে সোনা। খুকু আর সোনা দুজনেই জিলিপি খেতে খুব ভালবাসে, তাই তারা প্রায়ই জিলিপি খায়।"—এমনি করে যে-কোন ছবি থেকেই মৌলিক গল্প বানানো যায়।

এরপর ছবির অবলম্বন ছাড়াই শিশুরা নিজেদের খেলনার বিষয়ে, পোষা পশুপাখীর বিষয়ে, মাবাপ ভাইবোনদের বিষয়ে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে গল্প বলতে পারবে। শেষে শিক্ষকের কাছে শোনা এবং বইয়ে পড়া গল্পের পুনরাবৃত্তি করতে শিখবে।

গল্পবলার সময়ে দু'একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, ছাত্রকে যেন কখনও খুব লম্বা গল্প বলতে দেওয়া না হয়; লম্বা গল্পে বড়দেরই অনেক সময়ে খেই হারিয়ে যায়, ছোটদের তা নিয়ে অনাবশ্যক বিড়ম্বিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। নীচের ক্লাসের গল্পগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই, দু'একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যই এদের পক্ষে যথেষ্ট, কেননা পারম্পর্য রক্ষা করে তার বেশী ধারণ করবার ক্ষমতা শিশুর ক্ষুদ্রচিত্তের থাকে না। দ্বিতীয় কথা এই যে যখন সে গল্প শুনে বা পড়ে

গল্প বলবে তখন শিক্ষক যেন তাকে গল্পটি সম্পূর্ণভাবে নিজের ভাষায় বলতে বাধ্য না করেন। বইয়ের শব্দ ব্যবহার করে ফেলাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তাই সেটা এড়াবার চেষ্টা করতে করতে গল্পের খেই হারিয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা; তাছাড়া বইয়ের ভাষার আদর্শ স্বাভাবিকভাবে আত্মসাৎ করতে পারলে তাদের ভাল ছাড়া মন্দ হবার কথা নয়। তবে এইটুকু দেখতে হবে যে শিশু যেন অর্থটা পূরোপূরি বুঝতে পারে আর ভাষাটা চেষ্টা করে মুখস্থ না করে।

তর্ক এবং আলোচনা মৌখিক কাজের রূপভেদ। একেবারে নীচের শ্রেণীতে এর বিশেষ ব্যবহার নাই, কেননা আলোচনা বা তর্কের জন্য যুক্তিতর্কের ক্ষমতার যতটা বিকাশ দরকার ততটা নিতান্ত ছেলেমানুষের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর শিশুরা যখন অন্যের ভাষা, উচ্চারণ বা কথাবলার ভঙ্গির ভুল ধরে দেয় কিংবা কোন ছবি বা গল্প ভাল হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে তখনই এই বৃত্তি তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে থাকে। তারপর নিম্নমধ্য শ্রেণীগুলি থেকেই এর রীতিমত অভ্যাস করাতে করাতে উচ্চশ্রেণীতে পূরোদস্তুর আলোচনা ও তর্কসভার ব্যবস্থা হতে পারে।

আলোচনা ও তর্কের কাজের জন্য প্রবন্ধরচনার মতই যত্ন নেওয়ার দরকার। প্রবন্ধ লিখবার আগে যেমন বিষয়বস্তুটি নানাভাবে সবদিক দিয়ে আলোচনা করা হয়, আলোচনা ও তর্কের আগেও সেইরূপ করে নেওয়া দরকার। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুটির সঙ্গে ছাত্রেরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়ে গেলে পরে তাদের মধ্যে থেকে দুজন প্রধান ও দুজন অপ্রধান বক্তা বেছে দিতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে

অন্য সকলেও তর্কের অংশ গ্রহণ করে। ক্লাসের পাঠ্যের মধ্যে যদি কোন সমস্যাপূর্ণ বিষয় থাকে তাই অবলম্বন করে তর্ক বা আলোচনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাম্যজীবনের কোন একটি কবিতা পাঠের পর গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ-সম্বন্ধে তর্ক এবং ওয়াজেদ আলির "ভারতের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধ পাঠের পর পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের তুলনামূলক আলোচনা খুব সফল হতে দেখেছি। বাইরের বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা বা তর্ক করান হয় তবে দেখে নিতে হবে যে বিষয়টি যেন চিত্তাকর্ষক ও ছাত্রদের জীবনের সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত হয়।

তর্ক ও আলোচনাব মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। তর্কের জন্য দুটি প্রধান ও দুটি অপ্রধান বক্তা নির্দেশ করে দিতে হয় এবং তাদের বলা হয়ে গেলে পরে অন্য সবাই তর্ক করবার অধিকার পায়, আর আলোচনায় একজন বিষয়ের উত্থাপনকর্তা ও কয়েকজন প্রধান বক্তা নির্দিষ্ট থাকে। তর্কে প্রধানত বিষয়টির দুটি দিক দেখাতে হয়, কিন্তু আলোচনায় নানাভাবে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা যায়। তর্কে বক্তারা দুই পক্ষের কোন একটি অবলম্বন করে, আলোচনায় নিরপেক্ষ বক্তৃতার স্থান আছে। তর্কেব নিয়ম আইনপরিষদের নিয়মসমূহের অনুযায়ী গঠিত হয়, আলোচনার তেমন কড়া নিয়ম নাই।

উদারতা ও নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে তর্কের চেয়ে আলোচনা বেশী বাঞ্ছনীয়; অপরপক্ষে নিয়মানুযায়ী কাজ করবার পদ্ধতির (formal procedure) অভ্যাস বেশী হয় বলে কর্মজীবনের পক্ষে তর্ক অধিক কার্যকর। বস্তুত এই দুইই সমানভাবে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের উপযোগী।

বিশেষভাবে কথাবলার অভ্যাস ছাড়াও ক্লাসের অন্যান্য পাঠের মধ্যে দিয়ে কথাবলার যথেষ্ট অভ্যাস হয়, এইজন্য আজকাল প্রশ্নবহুল শিক্ষাপদ্ধতি এত আদৃত। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে: "Little children should be seen and not heard." কোন শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ এটিকে পরিবর্তিত করে বলেছিলেন "The class-teacher should be seen and not heard." কথাটি সম্পূর্ণভাবে মেনে না নিলেও এটুকু স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষক যত কম কথা বলে পাঠ্যবিষয়ের যতখানি ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবেন ততই তাঁর কৃতিত্ব বেশী।

পাঠ ও পাঠ্য

শিশুর পড়তে শেখা লিখতে শেখার আগে আসে। তার প্রথম কারণ, অক্ষরগুলির সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হবার আগে তার পক্ষে সেগুলির আকৃতি আঁকা সহজ নয়। দ্বিতীয় কারণ, পড়ার মধ্যে খালি চোখের কাজ আর লেখার সময়ে চোখ ও হাতের একযোগে কাজ করতে হয়।

আগেকার দিনের মত বর্ণপরিচয় ও অক্ষর মুখস্থ করার পথে পড়তে শেখার পদ্ধতি এখন অচল, তাই সমগ্র বাক্য বা শব্দ নিয়ে শিশুর পড়া সুরু হয়। কয়েক কারণে এই পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত বলে গৃহীত হয়েছে। প্রথমত, প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে আনন্দের স্থান ছিল না, মেরে ধরে অক্ষর মুখস্থ করানর মধ্যে যে ধরনের নীরস মজুরি আছে সেটা শিশুস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে পড়ার সহায়তার পরিবর্তে হানি হয়ে থাকে। পড়তে দুষ্টুমি করা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করা এই পদ্ধতির ব্যবহারের ফল। শিশু যাতে আনন্দ পায় সেই কাজই করতে চায়, কাজেই পড়তে শেখাবার জন্য যদি এমন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় যাতে শিশু প্রচুর আনন্দ লাভ করবে তবে সে এত মনোযোগ দিয়ে পড়বে যে অতি দ্রুতগতিতে তার শিক্ষা অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বর্ণের সূক্ষ্ম কারিগরী শিশুর অনভ্যস্ত চোখে ধরা পড়া অসম্ভব বলে শব্দের সমগ্র রূপই তার পক্ষে চেনা সহজ হয়।

জিনিষ বা তার প্রতিকৃতি দেখিয়ে বারবার তার সঙ্গে বেশ স্পষ্ট করে লেখা সেই জিনিষের নাম দেখাতে হবে। ক্রমে সেই শব্দগুলির আকৃতির সঙ্গে শিশু এত পরিচিত হয়ে যাবে যে জিনিষটা না দেখিয়ে তার লিখিত নাম দেখালেই সে বুঝতে পাববে। এইটাই শিক্ষার স্বাভাবিক পদ্ধতি, অভ্যাসের (Conditioning) ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই কাজের জন্য সুন্দর সুন্দর ছবি ও জিনিষ সংগ্রহ করে রাখতে হবে এবং মজবুত কার্ডবোর্ডে সুন্দর করে সেগুলির নাম লিখে রাখতে হবে। পড়তে শেখা হয়েছে কি না পরীক্ষা করবার জন্য জিনিষ বা ছবিগুলি এক জায়গায় আর তার নাম লেখা বোর্ডগুলি অন্য জায়গায় জড় করে রেখে শিশুকে মিলিয়ে দিতে বলা যায়। এতে খেলা এবং পড়া দুইই এক সঙ্গে চলবে।

এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শিশু সমগ্র বাক্যও পড়তে শিখবে। ক্লাসের স্থানে স্থানে স্পষ্ট অক্ষরে নানারকম নির্দেশ (directions) লিখে টাঙিয়ে রাখলে শিশুর সেগুলি বুঝবার জন্য পড়তে শেখার উৎসাহ হবে। যেমন কাগজ ফেলবার ঝুড়ির কাছে লিখে রাখা যায়:—"এখানে বাজে কাগজ ফেল"— বা যে দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে তার গায়ে লিখে রাখা যায়:—"দরজা বন্ধ কর" ইত্যাদি। নীচু ক্লাসে ছবি ও লেখা মিলিয়ে নোটিস্ দেবার পদ্ধতি খুব কার্যকরী, যেমন, যেদিন ইস্কুলের পর কোন খেলা থাকবে সেদিনকার নোটিসের সঙ্গে সেই খেলার ছবি দেওয়া যায়, অথবা যদি কোন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকে তবে নোটিসের সঙ্গে খাবারের বা ভোজের ছবি দেওয়া যায়। ক্রমশ শিশু ছবির সাহায্য ছাড়াই নোটিসের অর্থ বুঝতে পারবে।

অনেকে শিশুকে পড়তে শেখাবার জন্য "Sight Cards"এর ব্যবহার করেন; এক একটা লম্বা কার্ডবোর্ডের টুকরোয় এক একটা কাজের বর্ণনা বা হুকুম লেখা থাকে, শিশুদের সামনে সেগুলি একে একে তুলে ধরলে তারা সেই অনুযায়ী কাজ করবে। যেমন যে-সব কার্ডে "আমরা এমনি করে কাপড় কাচি," "আমরা এমনি করে ঘোড়ায় চড়ি," "আমরা এমনি করে নৌকা চালাই" ইত্যাদি কাজের বর্ণনা থাকে, সেই কার্ডগুলি দেখবামাত্র তারা তার অভিনয় করতে আরম্ভ করবে। যে-সব কার্ডে "উঠে দাঁড়াও," "বোসো," "দরজা খোলো," "দরজা বন্ধ কর" প্রভৃতি হুকুম লেখা থাকে সেগুলি দেখতে পেলে শিশু সেই হুকুম তামিল করবে। বোর্ডে যদি প্রশ্ন লেখা থাকে, শিশু মুখে তার উত্তর দেবে। এতে খেলা ও পড়ার মিশ্রণের সঙ্গে অভিনয়ের আনন্দ মিলে যাবে। কার্ডে লিখিত বাক্য-গুলিকে দুই টুকরো করে কেটে পরে মিলিয়ে দিতে দিলে এর পরীক্ষা হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করবার সময়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। খুব সাবধানতা অবলম্বন না করলে এর থেকে অনেক সময়ে শিশুদের অন্ধ অনুকরণের অভ্যাস হয়ে যায়। যারা বুদ্ধিমান তারাই হয়ত কার্ডগুলির অর্থ বুঝে কাজ করে আর অন্যরা কেবল তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের অনুসরণ করে।

বাংলা ভাষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগের আর একটি অন্তরায় ফলা ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার। কেউ কেউ যুক্তাক্ষর সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে শিশুসাহিত্যরচনার প্রয়াস করেছেন বটে, কিন্তু তার অসুবিধা এই যে শিশুর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত

বস্তু, মানুষ ও ভাবই এই পদ্ধতির ভিত্তি, অথচ সে-সবের যুক্তাক্ষরবর্জিত নাম খুঁজে পাওয়া অনেক সময়ে অসম্ভব, এবং খুঁজে পাওয়া গেলেও সরল অথচ অব্যবহৃত শব্দের চেয়ে পরিচিত অথচ অপেক্ষাকৃত জটিল শব্দের ব্যবহারই শিশুর পক্ষে সহজবোধ্য হবে। কাজেই এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সব চেয়ে ভাল; অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ও ফলা যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে; কিন্তু তার প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়লে তার ব্যবহারে ইতস্তত করলে চলবে না।

এর পর শিশুকে ছড়া পড়তে শেখান যায়। পড়তে শিখবার আগে থেকেই শিশুদের ছেলে ভুলোনো ছড়ার আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়ে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে রাখতে হবে। ইংরিজি নার্সারি রাইম্‌সের সচিত্র সংস্করণের মত বাংলায় কিছুই নাই, তাই শিক্ষককেই নিজের চেষ্টায় এর অভাব পূর্ণ করতে হবে। "খুকুমণির ছড়া"য় ছোট ছোট অনেক ছড়া সংগ্রহ করা হয়েছে, তা ছাড়া অন্যান্য শিশুপাঠ্য বই থেকে কবিতা জোগাড় করে তার উপযোগী ছবি এঁকে এক একটি ছবির সঙ্গে দু'এক ছত্র কবিতা খুব স্পষ্ট ও বড় করে লিখে দিতে হবে। দু'একটি ছোটদের বইয়ে এইরূপ ছড়ার প্রতি ছত্রের অনুযায়ী ছবি দেওয়া আছে। সেই আদর্শে বড় রঙিন ছবি করে নিলে শিশু খুব খুসী হবে ও কবিতাগুলি সহজে শিখে নেবে। কবিতা বা ছড়ার অভিনয়ও খুব ভাল হয়, বিশেষ করে যদি কিছু বেশভূষা সংগ্রহ করা যায়। ছড়ার মত করে গল্পও ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ান যায়।

অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের শিশুরা লিখতে শিখবার সময়ে যে ছবির বই তৈরী করে (লিখতে শেখার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

সেই বই যারা শুধু পড়তে শিখেছে তাদের দিলে তারা খুব উপভোগ করবে। এক এক বিষয়ের ছবি এক একটা বইয়ে সংগ্রহ করে তার নীচে নীচে সেই বিষয়ে লেখা থাকে ; যেমন একটা বইয়ে হয়ত নানারকমের এরোপ্লেনের ছবি সংগ্রহ করা হল, তাতে সরল ভাষায় এরোপ্লেনের বিষয়ে নানা কথা লেখা থাকবে। এমনি করে মোটরের বই, রেলগাড়ীর বই, পাখী, জীবজন্তু, ফুল, ফল, গাছ প্রভৃতি যা-কিছু শিশুর চিত্তাকর্ষণ করে তারই বিষয়ে এক একটি বই তৈরী করা যায়। ক্লাসে একটি আলমারি, বাক্স বা ডেস্কের মধ্যে সেগুলি সংগ্রহ করা থাকবে, প্রত্যেক শিশু নিজের ইচ্ছানুযায়ী এক একটি বেছে নিয়ে শিক্ষকের সাহায্যে পড়বে।

তারপর ক্রমশ পাঠ্যপুস্তকের ধরাবাঁধা পাঠের অধীন হবার সময় আসবে ; কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের লেখাগুলি অর্থ বুঝে পাঠ করলেই যথেস্ট হবে না, সেই সব বাক্য ও বিশিষ্ট ভঙ্গি নানাভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে হবে, ও নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে উল্লিখিত বস্তু ও ভাবসমূহের সঙ্গে পরিচয় সাধন করাতে হবে। যে-সব বিষয়ের কথা বইয়ে থাকবে সেগুলি নিয়ে নানাভাবে কথাবার্তা বলিয়ে শিশুর ভাষার উপর আধিপত্য বাড়াতে হবে। যেমন, বইয়ে যদি “আমি আম ভালবাসি” এই কথাটা থাকে তাহলে আমের বিষয়ে নানা কথাবার্তা বলা যেতে পারে,—কে কয় রকমের আমের কথা জানে, কে কোন জাতের আম খেতে ভালবাসে, ইত্যাদি ; আবার ‘ভালবাসা’ এই কথাটির সূত্রেও শিশুর মা-বাপের, ভাইবোনের, বন্ধুবান্ধবের, গৃহপালিত পশুপক্ষীর ভালবাসার কথা বলা যায়। এই সময়ের পাঠে বইয়ের চেয়ে মৌখিক আলাপ ও ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারটাই

অনেক বেশী প্রয়োজনীয়; শিক্ষক যদি ছবি আঁকতে পারেন তবে তো সোনায় সোহাগা।

পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা শিক্ষক ও ছাত্রের স্বাধীন কাজকেই বেশী প্রধান বলে ধরা হয়েছে বলে ভাষাশিক্ষার প্রথম স্তরে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার না করলেও চলে। ভাষাটাকে কি ভাবে আয়ত্ত করতে হবে সেটা যদি তাঁর জানা থাকে তবে স্ব-উদ্ভাবিত নানা বাক্য বোর্ডে লিখে লিখে শিশুর পাঠ তিনি সম্পূর্ণ করে দিতে পারেন।

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট বিধি জানার ও প্রয়োগের জন্য যদি শিক্ষকের পক্ষে বইয়ের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয় তবে বইয়ের প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির চটকের প্রতি নজর না দিয়ে পাঠ্যবিষয়টি যে বইযে সবচেয়ে সুসজ্জিত হয়েছে সেই বইটিকে আদর্শস্বরূপ নিতে হবে। অনেক সময়ে একাধিক বই অনুসরণ করলে এই সুবিধা হয় যে যে-বইয়ের যে অংশ উৎকৃষ্ট সেই অনুযায়ী শিশুকে পাঠাভ্যাস করান যায়।

আরো একটু উপরের ক্লাসে উঠে পাঠ্যপুস্তকের মারফতে শিশুকে নানাপ্রকারের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া যায়। ইংরিজি শিখবার সময়ে যেমন ভাষাটিকে আয়ত্ত করতেই শিশুর সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় বাংলার বেলায় তেমন হয় না বলে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার জ্ঞানদান সম্ভব হয়।

এই ভাবে অন্যান্য ক্লাসের পাঠগুলি বাংলার ক্লাসের মধ্যে একটি মিলনভূমি পেতে পারে (Correlation of Subjects)। বিদ্যালয়ে সাধারণত যে-সব পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয় তার মধ্য থেকেই এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়; যেমন "দার্জিলিং"

এই প্রবন্ধ পড়াবার সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয়ে নানা কথা বলা যায়, শরৎ বা বর্ষাকালের বিষয়ে কবিতা অথবা প্রবন্ধ পাঠ্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে শিশু ঋতুপরিবর্তনের বিষয়ে নানা তথ্য জানতে পারে, "বিমানপোত" প্রবন্ধ অবলম্বন করে তার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা চলতে পারে, "মুসলমান" কবিতার মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোলের মিলনের সুযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে যে নানা বিষয়ের আলোচনা করে শিশুর মনকে শিক্ষিত ও বুদ্ধিকে মার্জিত করতে হবে তার পরিমাণ পাঠ্যপুস্তকের পাঠের চেয়ে কিছু কম নয়।

অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় শিশুকে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে। যে সকল পাঠ্যপুস্তক সাধারণত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত আছে তাতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা পাওয়া গেলেও গদ্যাংশের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশেরই সাহিত্যিক মূল্য অতি কম। এ ক্ষেত্রে বালকবালিকার সাহিত্যপরিচয় একদেশদর্শী হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা, অর্থাৎ তারা কেবল কবিদেরই নাম ও পরিচয় জানতে পারবে এবং গদ্যসাহিত্যের ধারা তাদের অগোচর থেকে যাবে। এর প্রতিকারের উপায়ের বিষয়ে সাহিত্যপাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীগুলিতে যখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাংশ পড়ান হতে থাকবে তখন ছাত্রদের তার মূলের সঙ্গে এবং লেখকের জীবন ও অন্যান্য রচনার সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে। সম-উক্তিসঙ্কলনও এই সময়ের খুব প্রয়োজনীয় কাজ।

মোট কথা, বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলার শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে বইখানা পাঠের পথনির্দেশকমাত্র, বইয়ের মধ্যে ছাত্রের সমগ্র জ্ঞান আবদ্ধ থাকলে চলবে না, বইকে দ্বারস্বরূপ গ্রহণ করে তাই দিয়ে বিরাট সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশই শিক্ষকতার আসল উদ্দেশ্য। আমাদের ছাত্রেরা যে পড়া করে তার সংক্ষিপ্তসার খোঁজে "নোট" বইয়ে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে তাদের এই বোধে অভ্যস্ত করে রাখতে হবে যে পাঠ্যপুস্তকটাই তাদের নোট বা সংক্ষিপ্তসার, আসল পড়ার বিস্তার তার চেয়ে অনেক বেশী। বিলিতি ইস্কুলের সঙ্গে আমাদের প্রধান প্রভেদ এইখানে, এবং এই জন্যই দেখা যায় যে-সব ছাত্রছাত্রী বিলিতি প্রথায় শিক্ষা লাভ করে এসেছে তাদের জ্ঞান তুলনায় বেশী গভীর।

পাঠ্যপুস্তক বাছবার সময়ে তার চিত্তাকর্ষকতা ও সবসত্তাব প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক শিক্ষক চান না যে পড়ার বই বেশী চিত্তাকর্ষক হয়, কেননা, তা হলে নাকি ছাত্রেরা ক্লাসের পড়ার আগেই নিজেরা বইটা পড়ে শেষ করে রাখে। তাঁদের মতে এই ভাবে আগে থেকে পাঠ্যবিষয় জেনে গেলে ছাত্রদের আর ক্লাসের পড়ায় মন যায় না। এ যুক্তি সমীচান বলে মনে হয় না, কারণ আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে-বই আমাদের খুব ভাল লাগে সেটাকে দুবার কেন, দশবার পড়তেও খারাপ লাগে না। যদি পাঠ্যপুস্তক সত্যই যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে তবে কখনই একবার আগে পড়ে রাখলে ক্লাসের আগ্রহের হানি ঘটতে পারে না। তা ছাড়া শিক্ষকের শিক্ষকতার উপরও ছাত্রের মনোযোগ অনেকটা নির্ভর করে; শিক্ষক যদি ক্লাসের পড়াকে ব্যাখ্যা ও শব্দার্থের একঘেয়ে সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে

চলেন তবে বই যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, ছাত্রের সেটা আগে পড়া না থাকলেও একটুও ভাল লাগবে না। অথচ বহু পরিচিত ও পঠিত পুরাতন বইকেও যদি সাহিত্যালোচনার উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায়, তবে তাও ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা আকর্ষণ করবে। অনেক সময়ে অতি উৎকৃষ্ট কোনো সাহিত্যাংশ ক্লাসের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হলে দুঃখের সঙ্গে বলা হয়ে থাকে "অমন সুন্দর বইটাকে পাঠ্য করে একেবারে মাটি করে দিলে"—আমাদের সঙ্কীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন শিক্ষকতাই এই অনুযোগের মূলীভূত কারণ।

পাঠ্যপুস্তকেব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়বার (rapid reading) জন্য যে-সব বই নির্দিষ্ট থাকে তার বিষয়ে দুএকটি কথা বলার দরকার। এগুলি যে তাড়াতাড়ি পড়বার জন্য দেওয়া হয়েছে সে-কথা মনে রেখে এর সম্পর্কে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ বা ব্যাকরণের দীর্ঘ আলোচনা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সাধাবণ অর্থ ও ভাববোধই শিক্ষকের মূল উদ্দেশ্য হবে।

যে-কোন বই পড়ার আসল উদ্দেশ্য তাকে ব্যাখ্যা করে কেটেকুটে দেখা নয়, তার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে রস উপলব্ধি করা। বড়রা যখন বই পড়েন তাঁদের পাঠ এই বিশেষত্বদ্বাবা চিহ্নিত হয়; সকলে যে সব বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দেব অর্থ খুঁটিয়ে বুঝতে পারেন এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথচ তাতে সমগ্রভাবে বইটাকে উপভোগ করবার কোন বাধা ঘটে না। শিশুর তাড়াতাড়ি পড়বার বইগুলিও তাই ঠিক এই ভাবেই ব্যবহার করতে হবে। ছাত্রেরা নিজেরা পড়বে, অর্থবোধের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষক সাহায্য করবেন। অনেক সময়ে অপটু ছাত্রেরা নিজেদের অসুবিধা নিজেরাই বুঝতে পারে না,

অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রেরা কতটা বুঝেছে বা না বুঝেছে আবিষ্কার করে নিয়ে তার ব্যবস্থা করবেন। তা ছাড়া পড়তে আরম্ভ করার আগেও যদি শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে কি আশা করতে হবে সে বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিয়ে দেন তবে অর্থবোধের সুবিধা হবে।

দ্রুত পাঠের সময়ে ছাত্রের শুধু যে তাড়াতাড়ি পড়ে অর্থ-বোধের অভ্যাস হয় তা নয়, তার সাহিত্যবোধও জাগ্রত হয়। যে বই সে পড়ল সে বইটা তার ভাল বা মন্দ লাগার কারণ আলোচনা করতে করতে তার এই বোধ মার্জিত ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য একই পুস্তকসম্বন্ধে ছাত্রদের মধ্যে যে আশ্চর্য রকমের মতভেদ ঘটবে সে কথা বলাই বাহুল্য এবং মাঝে মাঝে তাদের প্রশ্ন করে এমন অদ্ভুত উত্তর পাওয়া যাবে যাতে শিক্ষককে স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হবে। যেমন, একবার কোন একটি ছাত্রীকে শরৎচন্দ্রের "মহেশ" খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে দেখে ভাল লাগার কারণ জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক উত্তর পেয়েছিলেন, "কি অদ্ভুত সব গালাগালি রয়েছে!" এ রকম সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অনেকবারই শিক্ষককে পড়তে হবে এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তাকে অতিক্রম করতে হবে। ধমক দিয়ে সাহিত্যবোধের ভুল শোধরান যায় না; এ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পরিচালনার দরকার। অবশ্য এমন রসগ্রাহী ছাত্রছাত্রীও দেখা যাবে যারা বড়দের মতই সুতীক্ষ্ণ, সুমার্জিত সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়ে শিক্ষককে পুরস্কৃত করবে।

ক্লাসের অন্যান্য বইএর চেয়ে দ্রুত পাঠের বইয়ের প্রকৃতি একটু ভিন্ন হওয়া দরকার। ভাষা ও ভাব বা রীতি ও আখ্যানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এই বই বাছতে হবে। ক্লাসের পাঠ্যের

ভাষার চেয়ে এই বইয়ের ভাষার বেশী সহজ হওয়া দরকার, কেন-না এই বই পড়বার সময়ে পদে পদে শিক্ষকের সাহায্য পাওয়া যাবে না। যে ক্লাসে পড়ান হবে তার দু'এক ক্লাস নীচের পাঠ্যপুস্তকের সমান যদি এর ভাষা হয় তা হলে বোধ হয় ছাত্রের স্বচেষ্টায় অর্থবোধ করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কঠিন ভাষা ও অনভ্যস্ত রীতি নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হলে ছাত্রেরা বইয়ের গল্প বা সাহিত্যিক উৎকর্ষ অনুভব করবার সময় এবং সুযোগ পাবে না তাতে তাড়াতাড়ি পড়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বইয়ের আখ্যানও যেন উপযোগী হয়। যে বই শিশুর স্বভাবতই ভাল লাগে সে বই ছাড়া অন্য বই সে কিছুতে তাড়াতাড়ি পড়তে পারবে না। খুব বেশী গুরুগম্ভীর উপদেশ বা ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্য যে বইয়ে থাকবে চঞ্চলমতি বালক-বালিকার সে বই পড়তে কখনও ভাল লাগবে না। এদের বইয়ে উদ্যম চাই, কাহিনীর দ্রুততা চাই, কৌতূহল ও প্রাণ-শক্তির খোরাক চাই। উজ্জ্বল বর্ণনা বা সাহসিকতার কাহিনী সমন্বিত বই সাধারণত অল্পবয়সী ছেলেপিলের ভাল লাগে। ঐতিহাসিক কাহিনী উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হলে এই কারণেই এদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হয়। শিশুর কল্পনাশক্তি প্রবল বলে কল্পনাপ্রধান বই তারা ভালবাসে। নীচের ক্লাসে পরীর গল্প ও উঁচুক্লাসে সাহসিকতার গল্প এই কারণেই প্রিয় হয়। এড্‌ভেঞ্চার ও রোম্যান্স এই একই কারণে একটু বড় ছেলেমেয়েদের চিত্ত গভীরভাবে আকর্ষণ করে। যে সব গল্পের বইয়ের নায়ক-নায়িকা অল্পবয়সা সেগুলি এদের বিশেষ উপযোগী। এই সব বইয়ের বিষয় পরে শিশুসাহিত্যের সম্পর্কে আলোচিত হবে।

পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধি

পড়া বলতে দুই রকমের পড়া বোঝায়, চেঁচিয়ে উচ্চারণ করে পড়া, আর মনে মনে পড়া। এই দুই প্রকারের পাঠকে আমরা সরব ও নীরব পাঠ বলে অভিহিত করব।

সরব পাঠ একটি শিল্পবিশেষ। যে ভাল করে পড়তে পারে তার পাঠ শুনতে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ভালবাসেন। এই সুন্দর অভ্যাস শিশুকে ছোটবেলা থেকে করাতে হবে। বুদ্ধিমান শিশু যখন অর্থ বুঝে চেঁচিয়ে পড়বে তখন তাব পাঠ এত পরিষ্কার হওয়া চাই যাতে শ্রবণমাত্র সকলের অর্থবোধ হয়, এত সহানুভূতির সঙ্গে পড়া চাই যাতে ভাবের সূক্ষ্ম তারতম্য তার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করতে পারে এবং গদ্য বা পদ্যের তালে তালে তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গীতের মত মাধুর্যের সঙ্গে ওঠানামা করা চাই। আদর্শপাঠের লক্ষণই এই তিনটি—প্রাঞ্জলতা, সহানুভূতি ও মাধুর্য। কবিতার ক্ষেত্রেই সরব পাঠের উপযোগিতা অধিক, কেননা, বর্ণের পর বর্ণ, বাক্যের পর বাক্য সংযোজিত হয়ে যে সম্মিলিতধ্বনির সৃষ্টি হয় চেঁচিয়ে না পড়লে তার মাধুর্য উপভোগ করা কঠিন।

চেঁচিয়ে পড়ার প্রথম উদ্দেশ্য ভাষার অর্থ পরিষ্কার করে বোঝা এবং তারপর গদ্য বা পদ্যের ছন্দোমাধুর্য অনুভব করে অপরকে করান। এইজন্য শিক্ষক প্রত্যেক পাঠের আগে নিজে আদর্শপাঠ শুনিয়ে ছাত্রদের তদনুযায়ী সরব পাঠে প্রবৃত্ত করবেন। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষকের পাঠ ও

উচ্চারণের ভঙ্গী সত্যই উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। তাই উচ্চারণ ও স্বরনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা আজকালকার শিক্ষকতাশিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

শিশুশ্রেণীতে ছোট ছোট বাক্য একসঙ্গে বলিয়ে শিশুদের উচ্চারণশুদ্ধি করার প্রথা প্রচলিত আছে। উচ্চারণশুদ্ধি এই সময়ের সরব পাঠের একটি উদ্দেশ্য। ছোট শিশুরা যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে অনেকেরই স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস থাকে না এবং অনেকে নানারকমের উচ্চারণ-বিকৃতিও নিয়ে আসে। বয়সের অল্পতাজনিত অনভ্যাসের ফলে শিশুর উচ্চারণের যে সব দোষ থাকে সেগুলির সংশোধন শিক্ষকের আদর্শানুযায়ী আপনিই হয়ে যায়। কিন্তু সত্যকারের বিকৃতির সংশোধনই কঠিন।

বিভিন্ন পরিবারের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের পরিবার, সামাজিক স্তর ও প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রকারের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে থাকে। নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহের ভুলগুলি তার মধ্যে প্রধান—

১। শয়ের (sh) জায়গায় সয়ের (s) উচ্চারণ।

২। রয়ের জায়গায় ড়য়ের এবং ড়য়ের জায়গায় রয়ের উচ্চারণ।

৩। ল ও নয়ের বিপর্যয়, যথা নাউ (লাউ), লৌকা (নৌকা) ইত্যাদি।

৪। ঘোষবৎ বর্ণের জায়গায় অঘোষ বর্ণের উচ্চারণ, যথা মাজখানে (মাঝখানে)।

উপরিউক্ত কারণেই উচ্চারণ ছাড়া প্রকাশভঙ্গিরও ভিন্নতা দেখা যায়।

বালকবালিকার বদ্ অভ্যাস, শারীরিক গঠন বা উচ্চারণের কোন কোন দোষজনিত উচ্চারণ-বিকৃতিও অনেক সময়ে ঘটে। যেমন তোৎলামি, নাকে কথা বলা, খুব জোরে নিশ্বাস নেওয়া, কথা বলতে বলতে ক্রমাগত নাকটানা, টেনে সুর করে কথা বলা, অর্ধউচ্চারিত ভাবে অতিরিক্ত দ্রুত কথা বলা, ইত্যাদি। সামান্য বধিরতা অথবা অমনোযোগিতার দরুণ শিশু যদি সম্পূর্ণ শব্দ ভাল করে শুনতে না পায় তা হলেও উচ্চারণেব ভুল ঘটে থাকে।

এর মধ্যে যেগুলি বদ্ অভ্যাস থেকে উদ্ভূত সেগুলি সহজে শোধরান যায়। শারীবিক বিকৃতির জন্য বিশেষ চিকিৎসা এবং ব্যবস্থার দরকার, সেগুলির আলোচনা প্রস্তুতের বহির্ভূত; কিন্তু তার উপর শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

একবার শিক্ষকতার পরিদর্শনের সময়ে এরূপ একটি বিকৃতির উদাহরণ আমার চোখে পড়েছিল। একটি মেয়ের সরব পাঠের ও কথা বলার সময়ে প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে নিশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস ছিল, তার দরুন তার পাঠ অবোধ্য হয়ে পড়ত। আমাকে পর পর দুই দিন এই ক্লাসের পড়া পরিদর্শন করতে হয়েছিল। প্রথম দিন যে ছাত্রশিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন তিনি বালিকার পাঠের ধরণ দেখে এত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে সেই অবসরে সেই ক্লাসের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীরা তাঁকে জানিয়ে দিল যে ওই মেয়েটি তোৎলা এবং কোনদিন কোন পড়া পারে না; ছাত্রশিক্ষয়িত্রীও তৎক্ষণাৎ সেই মেয়েটিকে বসতে বল্লেন ও সমস্ত ঘণ্টাটি তাকে সযত্নে এড়িয়ে চল্লেন। এতে পাঠবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দুটি দোষ ঘটল; ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের

পরামর্শে কোন বিশেষ ছাত্রীসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রথম এবং একটি বালিকাকে পাঠের অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া দ্বিতীয় দোষ। কিন্তু এই দোষ দুটি ছাড়াও যে অন্যায় ঘটল সেটা অনেক গুরুতর; একটি বিকাশোন্মুখ মনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট করে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় দিন ওই ক্লাসে অপর একজন ছাত্রশিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন। সেই তোৎলা মেয়েটি পড়তে আরম্ভ করামাত্র আগের দিনের মতই শিক্ষয়িত্রী এবং অন্যান্য ছাত্রীদের কলরব উঠল, কিন্তু এই ছাত্রশিক্ষয়িত্রী মুহূর্তের মধ্যে গোলমাল থামিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির পাঠবিকৃতি শোধরাতে উদ্যত হলেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম দু'একবার চেষ্টা করেই সে প্রায় স্বাভাবিকভাবে পড়তে পারল এবং শিক্ষকতার সময়ে তিনি এই মেয়েটিকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রশ্নের সমান অংশ বণ্টন করে দিলেন এবং সেও সমান উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিবার চেষ্টা করতে লাগল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়লে মেয়েটি একমাসের ভিতরই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠত।

পাঠবিকৃতি শোধরানর বহু পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেগুলির সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি সহানুভূতি, এ ভিন্ন কোন উপায় নেই। সরব পাঠের সময়ে যে বিকৃতি ধরা পড়ে অভ্যাসের দ্বারা তার সংশোধন করা হয়। সংশোধন করবার সময়ে শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যে শিশুর পাঠে কোন বিশেষ বিকৃতি থাকে সে ফলত লাজুক ও ভীরু হয়ে পড়ে; কাজেই সংশোধন করতে গিয়ে যেন কোন রকমে তার প্রতি সমগ্র ক্লাসের সকৌতুক দৃষ্টি পতিত না হয়। তা যদি

হয় তবে লজ্জা ও সংকোচের চাপে সেই ছাত্রের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এই জন্যে সমস্বরে সরব পাঠের প্রবর্তন। এর কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত একজনের উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য সবাইকে সমস্বরে সরব পাঠে প্রবৃত্ত করলে সকলের ক্ষতি না করে অতি সহজে, শিক্ষকের সুপরিচালনের গুণে, সে কাজ সম্পন্ন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সবাইকে একসঙ্গে পড়তে হলে সকলকে তাল রেখে পড়তে হবে, তাতে ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দের পরিচয়লাভ সহজে হবে ও আদর্শ সরব পাঠের ভিত্তি স্থাপিত হবে। সর্বশেষ কথা এই যে নীচের শ্রেণীর ছেলেপিলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়তে আনন্দও পায়।

সমস্বরে সরব পাঠের বিপদ এই যে এতে গোলে হরিবোল দেওয়া সহজ, সেইদিকে শিক্ষককে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া ভাষার তালরক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সুর করে পড়ার অভ্যাস হয়—সেটা এড়িয়ে চলতে হবে।

ক্লাসের সব শিশুকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে পড়তে না দিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ করে, একেক দলকে আলাদা করে পড়ালে দলবদ্ধ পাঠের দোষ বর্জন করে উপকারিতাটুকু রাখা যায়। এইরূপ পাঠের জন্য প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের মত কোন নাটকীয় রীতি অবলম্বন করলে ছাত্ররা বিশেষ আনন্দিত হবে। অভিনয়ের ব্যবহারও এরূপ ক্ষেত্রে উপযোগী।

সমস্বরে সরব পাঠ ভিন্নও ক্লাসের শিশুরা যখন সাধারণভাবে কোন কাজে ব্যাপৃত আছে সেই সময়ে শিক্ষক যদি একেকটি শিশুকে কাছে ডেকে ক্লাসের একপ্রান্তে বসে তার সঙ্গে নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলতে বলতে ব্যক্তিগতভাবে তার উচ্চারণ-শোধনের চেষ্টা করেন তবে খুব সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষক যদি প্রত্যেকটি শিশুকেই একেকবার কাছে ডেকে তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করেন তবে যে শিশুর উচ্চারণ বিশেষভাবে বিকৃত তার প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার দরকার হয় না।

একা এবং সমস্বরে এই দুইরকমের সরব পাঠ মিলিয়ে মিশিয়ে অভ্যাস করানো ভাল। এর একটা ক্রম অনুসরণ করতে হয়। নীচের ক্লাসে যখন একেকটি বিচ্ছিন্ন বাক্য এবং ছোট ছোট ছড়া পড়ান হয় তখন সমস্বরে সরব পাঠই বেশী উপকারী এবং আনন্দদায়ক। ক্রমশ ছাত্র যত টানা-ভাবে ও বিশুদ্ধ করে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে আসবে তত সমস্বরে পাঠ কমিয়ে দিয়ে একা একা পড়ার অভ্যাস করতে হবে। এই ভাবে উপরের ক্লাসে সমস্বরে পাঠ একেবারে বর্জ্জন করা যায়।

উঁচুক্লাসে কবিতা ছাড়া সরব পাঠের পদ্ধতিই যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া ভাল। বড়রা যখন পড়েন তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রায় কখনই চেঁচিয়ে পড়েন না, নীরব পাঠই পাঠের পূর্ণ পরিণতি এবং জীবনে সবচেয়ে কার্যকর।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দিনেও বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বানান করে পড়তে শেখানর পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং এই পদ্ধতির ফলে অনেক শিশুই পাঠে পটুত্ব লাভ করবার আগে পর্যন্ত বানান করে করে পড়ে; এমন ছাত্রও দেখা যায় যে বড় হয়েও সে চেঁচিয়ে না পড়লে কোন বিশেষ পাঠ্যাংশের অর্থ ভাল করে বুঝতে পারে না। এদের নীরব পাঠ অনেক সময়ে সরব পাঠের রূপান্তর মাত্র হয়ে থাকে, হয়ত পড়ার সময়ে কোন শব্দ না হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঠোঁট নড়ছে।

বানান করে পড়তে যে অনেক বেশী সময় লাগে তা বলা

বাহুল্য এবং সাধারণভাবে সরব পাঠেই প্রত্যেকটি অক্ষর ঠোঁট জিভ ইত্যাদির সাহায্যে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতে হয় বলে নীরব পাঠের চেয়ে বেশী সময় লাগে। তা ছাড়া সরব পাঠে অক্ষরগুলি একে একে পড়তে হয় বলে পাঠ্যবস্তুটিকে সমগ্রভাবে দেখা যায় না।

এই দুই দিক দিয়েই নীরব পাঠের উৎকষ অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত উপরের শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও কাঠিন্য যখন ক্রমশ বেড়ে চলে তখন নীরব পাঠের অভ্যাস না থাকলে বিপদ হয়। তাই নীচের ক্লাস থেকেই ছাত্রদের অল্পে অল্পে নীরব পাঠে অভ্যস্ত করে রাখতে হবে যাতে উপরের ক্লাসে উঠে অসুবিধা না হয়।

মনশ্চক্ষে সমগ্র শব্দ বা বাক্যাংশের প্রতিরূপ দর্শন কববার ক্ষমতাই নীরব পাঠের ভিত্তি, এবং এই অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই ছাত্রকে সরব পাঠ থেকে নীরব পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করে নিতে হবে। একেকটি শব্দ বোর্ডে লিখে, শিশুদের অল্পক্ষণ তাব দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে তারপর মুছে দিয়ে সেটি বলতে বা লিখতে দিলে সেই অভ্যাসেব মধ্যে দিয়ে নীরব পাঠের ভিত্তি স্থাপিত হবে। এই কাজে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশুরা ক্রমশ সমগ্র বাক্যাংশের ছায়াও মনের মধ্যে মুদ্রিত করে নিতে পারবে। তারপর সহজ ও সংক্ষিপ্ত অংশ মনে মনে পড়ে তার সারার্থ সংগ্রহ করতে করতে ক্রমশ সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বা গ্রন্থই নীরবে পাঠ করে অর্থবোধ করবার অভ্যাস হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম যে পাঠ নীরবে পড়তে দেওয়া হল তার প্রধান প্রধান অংশ চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে, পরে প্রধান বিষয়টুকু আপনি আবিষ্কার করবার ক্ষমতা জন্মাবে।

নীরব পাঠের উচ্চতর স্তর সারগ্রহণ (skimming) বা চোখ বুলিয়ে অর্থবোধের ক্ষমতা। নীরব পাঠ যত দ্রুতই হোক না কেন তাতে প্রত্যেক শব্দের উপর দিয়ে দৃষ্টিকে চালিত করতে হয় বলে কিছু সময় যায়; কিন্তু এর চেয়ে দ্রুতবেগে কোন অংশের সারগ্রহণ করবার দরকার হলে কেবলমাত্র প্রধান অংশগুলির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে সমগ্র অর্থটা বুঝে নেবার ক্ষমতা চাই। নীরব পাঠে খুব পটু না হলে এ ক্ষমতা লাভ করা যায় না। পাঠ্যবিষয়ের অংশবিশেষের তলায় চিহ্ন দিয়ে এর অভ্যাস করান যায়। যে-সব ছেলেপিলে খুব বেশী গল্পের বই পড়ে তাদের অনেক সময়ে আপনিই এই অভ্যাস হয়ে যায়।

পরীক্ষার সময়ে পঠিত বিষয় পুনঃপাঠের জন্য অথবা অতি দ্রুত কোন অংশের সারগ্রহণের জন্য এই অভ্যাসের প্রয়োজন।

লেখা

পড়ার পরে লেখা। আগে চোখের সাহায্যে বর্ণমালার আকৃতিগুলি চিনে নিয়ে পরে সেগুলি হাতের পেশীর সঞ্চালনের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। পড়ার চেয়ে লেখা কঠিন, কেন না চোখে দেখে চেনার মধ্যে কেবল চোখের সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে, কিন্তু লেখার মধ্যে মস্তিষ্কের মারফৎ চোখ ও হাতের পেশীসমূহের একটা সামঞ্জস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার (co-ordination) প্রয়োজন।

শিশুর গতিবিধি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তার পেশীসমূহকে সূক্ষ্মভাবে সংযত করে পরিচালন করার ক্ষমতা পরিপক্ক হতে একটু দেরী হয়। যেমন বন্য ঘোড়াকে ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে রশ্মির সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতমাত্রের বশ করতে অনেক প্রয়াসের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর পক্ষে অবাধ্য ও অনভ্যস্ত পেশীসমূহকে আয়ত্ত করাও বহু সাধনাসাধ্য।

লিখতে শিখবার আগে নানারকম খেলার দ্বারা শিশুর পেশীপরিচালন ক্ষমতাকে (muscle control) দৃঢ় করতে হবে। তেঁতুলবীচি বা পাথরের টুকরো সমান রেখায় সাজান বা বিল্ডিং ব্লক্‌স্ (building blocks) দিয়ে বাড়ীঘর তৈরী করা প্রভৃতি খেলার দ্বারা এই কাজ সাধিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে লেখার যন্ত্রপাতির সঙ্গেও শিশুর পরিচয় করিয়ে রাখতে হবে। দেখা গিয়েছে যে শিক্ষিত পরিবার থেকে

আগত শিশু অশিক্ষিত পবিবার থেকে আগত সমান অথবা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি লিখতে শিখে থাকে। লেখাপড়ার যন্ত্রপাতির সঙ্গে পূর্বপরিচয়ই এব কারণ-স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রথমে লেখার উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা মোটা তাই শিশুর হাতে দিতে হবে। পেন্সিল বা কলম পরিচালন করবার মত সূক্ষ্ম গতিবিধি তার অনভ্যস্ত পেশীর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই এসব তার হাতে দিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। স্কুলের নীচের ক্লাসেব ঘরের দেওয়ালের অন্তত একটা দিকের সমস্তটা জুড়ে খুব নীচু করে লম্বা কালো বোর্ড ঝুলিযে রাখা চাই; ঘরের চারিদিকে এ ব্যবস্থা থাকলেই ভাল। এই বোর্ডের উপর মোটা রঙিন খড়ি দিয়ে শিশুর প্রথম লেখার প্রয়াস মুক্তি পাবে। এই লেখা বর্ণমালার অনুলেখন নয়, যথেচ্ছ আঁচড় কেটে লেখন-যন্ত্রেব পরিচালনের অভ্যাসমাত্র। প্রথম প্রথম হয় ত সে খড়ি ধবতেই পারবে না, হয় ত একটা রেখাও আঁকতে পারবে না, কিন্তু সে অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে ক্রমশ চেষ্টা করেই চলবে, এবং শিক্ষকের অতি অল্প সাহায্যেই নানারকমের দাগ কাটতে পারবে। আমাদের দেশে শিশুকে যে হাতে খড়ি দিয়ে উঠোনে ছেড়ে দেওয়া হত তার একটা উপকাব ছিল এই যে লিখবার বিরাট ক্ষেত্র পেয়ে শিশুর লিখবার ইচ্ছাও বিরাট হয়ে উঠত। ঘরের ছেলেপিলেদের যে দেখা যায় এক-টুকরো খড়ি বা পেন্সিল পেলে সমস্ত ঘর দোর রং করে ফেলে, সেও ওই প্রবৃত্তিরই রূপান্তর।

আর একটু বড় শিশুকে রঙের গোলা আর মোটা তুলি দিলে হাতের স্পর্শ খুব পরিষ্কার হবে (delicacy of touch)।

ক্রমশ শিশু যে-সব আঁচড় কাটতে থাকবে তার আকার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং গোল চারকোনা প্রভৃতি নানা-রকমেব আকৃতির মধ্যে মধ্যে শিশুর দু'একটি অতি প্রিয়বস্তুর মূর্তিও উঁকি মারতে থাকবে। অবশ্য এগুলি স্বেচ্ছায, সচেস্ট-ভাবে অঙ্কিত নয়, শিশুর অবচেতনসত্তার সৃষ্টি ; এ সব মূর্ত্তি শিশু সব সময়ে আঁকে না এবং চেষ্টা করে সচেতনভাবে আঁকতে তো পারেই না।

এই সময় থেকে শিশুকে অক্ষরেব আকৃতির সঙ্গে পবিচিত কবে দিলে সেগুলিও ধীরে ধীবে তার রেখাসমূহেব মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে। মাদাম মন্তেসরিব শিশুশিক্ষার নিয়মানুযাযী মোটা কাগজে কাটা অক্ষরের আকৃতি শিশুব হাতে দিলে শিশু সেগুলি হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে, তার উপর আঙুল বুলিযে, বালিব পাত্রে (sand-tray) তাব ছাপ ফেলে বা আঙুল দিয়ে সেগুলি অবলম্বনে বালিতে দাগ কেটে (tracing) সেগুলির আকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করতে থাকে।

যে শিশু তুলি দিয়ে লিখতে শিখেছে তাকে বাংলা অক্ষবের Stencil দিলে সেগুলির উপর যেমন তেমন করে তুলি বুলিয়েই সে বেশ সুন্দর অক্ষর আঁকতে পারবে।

হঠাৎ দেখা যাবে শিশুর হিজিবিজি চিত্রসমূহের মধ্যে মধ্যে দু'একটি অক্ষরও উঁকি মারছে। হয় ত অক্ষরের আকৃতিগুলি বিশুদ্ধ নয়, হয় ত সেগুলি উল্টোপাল্টা, বাঁকাচোরা নানা মূর্তিতে এসে উপস্থিত হয়েছে, হয় ত সেগুলিব সম্বন্ধে শিশু সচেতনও নয় এবং চেষ্টা করলে লিখতেও পারবে না, তবু সেগুলি অক্ষরেরই স্মৃতির ছায়া। এখন এদের অবচেতনলোক থেকে চেতনার আলোকে উপনীত করাই শিক্ষকের মস্ত বড় কাজ।

শিশু একদিকে যতদিনে চিত্রের সাহায্যে অল্প অল্প পড়তে শিখেছে, অপরদিকে ততদিন ধরে ক্রমাগত অক্ষরের প্রতিকৃতি চিত্রিত করে চলেছে। এই দুটি প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে চলতে একদিন দুইয়ের সংযোগ নিশ্চয়ই ঘটবে; সেইদিনই শিশুশিক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ এবং সেইদিন থেকেই সচেষ্ট অধ্যবসায়-দ্বারা তার ক্রমোন্নতি হতে থাকবে।

ক্লাসের ঘরে যদি রঙিন ছবি ও তার সঙ্গে যুক্ত শব্দ চারি-দিকে টাঙান থাকে তবে শিশুর লেখা সহজ হবে। পরে সে নিজেই জিনিষের নাম লিখে কেটে কেটে ছবির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে পারবে। নানারকম লেখার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি সফল হয়ে ওঠে।

যে-সব শিশু এই আধুনিক প্রক্রিয়ায় লিখতে শেখে, অনেক দিন ধরে লেখার যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এদের হাতের লেখা প্রায় ভালই হয়। তা ছাড়া এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুর লিখতে শেখার প্রথম স্তর ছবি আঁকা (drawing) ও হাতের কাজের (handwork) পর্যায়ভুক্ত হয় বলে শিশু চিত্রাঙ্কণেব মতই মনোযোগেব সঙ্গে সুন্দর লিপিমালা প্রস্তুত করে।

নীচের ক্লাসে সব বিষয়ে পৃথক পৃথক ঘণ্টা থাকার বদলে একসঙ্গে দুই তিনটি বিষয়ের শিক্ষা অন্য দিক দিয়েও ভাল। এতে শিক্ষাব সমগ্রতাবোধ হওযার ফলে অখণ্ড, পূরো মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপন হয় এবং মাতৃভাষাকে সকল শিক্ষাপ্রেরণার মূল-স্বরূপে পাওয়া যায়।

অক্ষর লিখবার পর শিশু সচেতনভাবে বস্তুবিশেষের নাম লিখতে যখন আরম্ভ করবে তখন তাকে ছবির বই বানাতে দিলে

তার খুব আনন্দ ও উৎসাহ বাড়বে। একটা সাধারণ ব্রাউন-কাগজের খাতা বানিয়ে তাতে রঙিন ছবি এঁকে বা কোন জায়গা থেকে কেটে নিয়ে লাগিয়ে তার বই তৈরী হবে (Scrap Book)। প্রথম প্রথম সে জিনিষগুলির নাম লিখেই সন্তুষ্ট হবে, তারপর ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিষয়ে এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করে লিখতে চাইবে। এই সময়ে তাকে কয়েকটি আলাদা আলাদা বই করতে দিলে ভাল—যেমন এরোপ্লেন, জাহাজ, মোটর, ফুলফল, গাছপাতা, জীবজন্তু সব কিছুর বিষয়ে এক একটি বই সে তৈরী করতে পারে। এতে লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও শ্রেণীবদ্ধ ও সজ্জিত হয়ে থাকায় সে খুব উপকৃত হবে।

যে সব ছড়া বা গল্প শুনতে শিশু অভ্যস্ত সেগুলি সংগ্রহ করে সে একটা বইয়ে লিখতে পারে, আবার স্বরচিত গল্প ও ছড়া লিখবারও আলাদা খাতা চাই। এই ভাবে হাতের লেখার অনুশীলনই তাকে রচনার দ্বারে নিয়ে যাবে।

আগে বলেছি যে এই পদ্ধতিতে যে সব শিশু লিখে থাকে তাদের হাতের লেখা স্বভাবতই ভাল হয় বলে আলাদা করে হাতের লেখা না লেখানই ভাল। যত্ন করে নিজের হাতে ছবির বই তৈরী করা সমান উপকারী এবং তাতে সৃষ্টির আনন্দ ও গর্ব মিশে থাকে বলে হাতের লেখার নীরস প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক। যে শিশু ছু'পাতা হাতের লেখা লিখতে সমপরিমাণে কালী ও চোখের জলের ধারা বইয়ে দেবে, সে-ই হয় ত বিনা আয়াসে একটি সম্পূর্ণ ছবির বই তৈরী করতে পারবে। হাতের লেখা যদি লেখাতেই হয় তবে অনুলেখনের বই (copy book) ব্যবহার না করে শিক্ষকের নিজে হাতে

শিশুর খাতায় একছত্র লেখা তুলে দেওয়া ভাল ; কেন না তাতে শিক্ষকের হাতের চালনার ভঙ্গি দেখে শিশু উপকৃত হতে পারবে। অবশ্য শিক্ষকের হাতের অক্ষর ভাল না হলে অনুলেখনের বই ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

হাতের লেখার ভালমন্দ বিচারের সময়ে শুধু অক্ষরের ছাঁদ দেখলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে সেগুলির আযতন সমান হয়েছে কি না, দুই শব্দের মধ্যে সমান ব্যবধান আছে কি না, লাইন সোজা হয়েছে কি না, এবং সর্বশেষে হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হযেছে কি না। শিশু যখন প্রথম প্রথম লিখতে আরম্ভ করবে তখন বড় কাগজে বড় বড় লাইন টেনে দিয়ে তাকে বড় বড হরফ লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। ক্রমশ সাধারণ খাতার লাইনেই তাব চলবে, তবে শেষ পর্যন্ত যেন সাদা খাতায় লাইন সোজা রেখে লেখার অভ্যাস করানটাই আদর্শ থাকে। হাতের লেখা খুব ভাল হলেও যদি কালীব ছিটা বা কাটাকাটিতে ভবা থাকে তা হলে তা নিন্দনীয। পরিচ্ছন্নতা (neatness) যে কোন শ্রেণীর লেখার প্রধান অঙ্গ। একটু বড় ছেলের লেখায ছেদচিহ্নের প্রয়োগ বিশুদ্ধ হওযা চাই।

লিখবার সময়ে বসার ভঙ্গি এবং কাগজ ও কলম ধরবা পদ্ধতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। কলম যদি ঠিক করে ধরা না যায় তা হলে লেখা ভাল হতে পারে না, তাড়াতাড়ি লেখার অসুবিধা হয় এবং লিখতে লিখতে সহজেই হাতে ব্যথা হয়ে যেতে পারে। কাগজ ধরবার ও বসার ভঙ্গির দোষ সাধারণত এক সঙ্গেই হয়। ঠিক করে বসতে না পারলে সোজা করে কাগজ ধরা যায় না, আবার সোজা করে কাগজ

ধরা না থাকলে বসারও সুবিধা হয় না। বাঁকা করে বসলে বা কাগজ ধরলে বক্রদৃষ্টিতে দেখে লিখবার ফলে চোখ খারাপ হয়, আবার অনেক সময়ে যাদের চোখ খারাপ থাকে তারা বাধ্য হয়েই বাঁকা হয়ে বসে, কাগজ বাঁকা করে রেখে লেখে। তাই শিক্ষকের এই দোষ সংশোধন করবার আগে ভাল করে মূলানুসন্ধান করা উচিত।

সর্বশেষে শ্রুতিলিখনের (dictation) বিষয়ে দু'একটা কথা বলব। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত বানানবিশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য শ্রুতিলিখন করান হয়ে থাকে। কিন্তু এতে বানানশিক্ষাব কোন সুবিধা তো হয়ই না, বরংচ শিশুর অন্ধভাবে মুখস্থ করার অভ্যাস হয়। তার চেয়ে ভূয়োলিখনের অভ্যাসদ্বারা বানান ঠিক করা ভাল। বড়দের মধ্যেও অধিকাংশ লোকই এইভাবে নিজেদের বানানসমস্যাব সমাধান করেন। দুটি বানানের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ তা দেখতে হলে প্রায় সকলেই দুটিকে পাশাপাশি লিখে যেটি সুদৃশ্য সেটিকে বেছে নেন। এইটিই যখন স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং ভাষাবিজ্ঞানের বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকলে এইটিই যখন একমাত্র পথ তখন শিশুকে অনাবশ্যক পীড়া না দিয়ে সহজ পথে অগ্রসর করে দেওয়াই ভাল।

শ্রুতিলিখনের দোষ কেটে যায় যদি শিশুকে যে অংশটি লিখতে দেওয়া হবে সেটি সে আগে থেকে পড়ে আসে; এমন কি, যে সব শব্দ লিখতে তার মুস্কিল হওয়ার কথা, লিখবার সময়ে যদি সেগুলি বোর্ডে লিখে রাখা যায় তা হলে আরো ভাল। শ্রুতিলিখনের জন্য সুন্দর সুন্দর কাব্যাংশ বেছে দিলে ছাত্রদের লিখতেও ভাল লাগবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অংশের পরিচয়ও তারা লাভ কববে। তাদের স্বয়ংসঞ্চয়নের মধ্যে

থেকে শিক্ষক শ্রুতিলিখনের উপযুক্ত কাব্যাংশ বেছে নিতে পারেন, আবার শ্রুতিলিখিত অংশগুলির দ্বারা তাদের সঞ্চয়নও সমৃদ্ধ হতে পারে।

প্রথম প্রথম শ্রুতিলিখনের ভিত্তিস্বরূপ অনুলেখনের ব্যবহার হতে পারে। বই অথবা বোর্ড দেখে সুসাহিত্যের নকল করতে করতে শিশু শ্রুতিলিখনের স্তরে উত্তীর্ণ হবে। সুসাহিত্য শ্রবণ ও সংগ্রহই শ্রুতিলিখনের আসল উদ্দেশ্য, বানানবিশুদ্ধি আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

রচনা

কোন কিছু গড়ে তোলাকেই রচনা বলা যেতে পারে। ভাষার রচনা যে কাগজে লিপিবদ্ধ করতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। শিশু যখন প্রথম মুখে মুখে বাক্যরচনা করে তখন থেকেই তার রচনার সূত্রপাত হয়; লিখতে পড়তে শিখবার আগেই শিশু এইরূপ মৌখিক রচনার পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেয়। "আমি আম খাব" বা "গোলাপফুল লাল"—শিশুমনের সম্পূর্ণ রচনা।

লিখতে শিখে প্রথম প্রথম কিছুদিন শিশু তাব ছবির খাতায় অন্যের রচিত গল্প ও ছড়া লিখবাব অভ্যাস করার পর মৌলিক স্বরচিত বাক্য লিখতে আরম্ভ করবে। প্রথমে হয় ত ছবিব নামমাত্র লিখেই ক্ষান্ত হবে, কিন্তু ক্রমশ স্বরচিত গল্প বা বর্ণনা লিখতে শিখবে।

রচনার মূল বাক্য। শিশু প্রথমে সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বাক্য বলতে শিখবে, পরে খাতায় লিখবে। এইজন্য শিশুর বাক্য-গঠনের দিকে শিক্ষককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে শিশুকে দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করিয়ে নেবার চেষ্টা যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন না করে। কথোপকথনের সময়ে প্রশ্নের উত্তরে সব সময়ে সম্পূর্ণ বাক্য বলা সুরীতি নয়; যেমন, শিক্ষক যদি প্রশ্ন করেন "আজ তুমি কি দিয়ে ভাত খেয়েছ?" তার উত্তরে ছাত্র যদি বলে "আজ আমি ডাল, মাছভাজা আর আলুপটলের

ডালনা দিয়ে ভাত খেয়েছি," তা হলে ভুল হবে, কেন না, ওই প্রশ্নের ব্যাকরণসম্মত ও রীতিসম্মত উত্তর—"ডাল, মাছভাজা আর আলুপটলের ডালনা।" তাই কোথায় সম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োজন এবং কোথায় নয় শিশুকে তা শেখাতে হবে।

বিশুদ্ধ বাক্য রচনার পরের স্তর বাক্যপরম্পরা সজ্জিত করার অভ্যাস; গল্পের সাহায্যেই এই অভ্যাস সহজে করানো যায়। মৌখিক কাজের পরিচ্ছেদে চিত্রভূমিক মৌখিক রচনার কথা বলা হয়েছে; লিখবার সময়েও এই রীতির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়, এমন কি দুই কাজ এক সঙ্গে মিশিয়েও করা যায়, যেমন, শিশু মুখে মুখে যে গল্পটি রচনা করল সেটা পরে লেখা রচনা হিসাবে খাতায় লিখতে পারে।

শিখবার সময়ে এই রচনা প্রথম প্রথম মৌখিক রচনারই মত সংক্ষিপ্ত হবে, তারপরে ক্রমশ একাধিক অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ গল্প লেখান যায়। অনুচ্ছেদ-রচনা রচনার একটি কঠিন অঙ্গ। বিষয়বস্তু কি করে সুসমঞ্জস ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় সেটা হয় ত শিশু সহজে বুঝতে পারবে না, তাই পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টি ও সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ রেখে দেখিয়ে দিতে হবে কোনটি বেশী ভাল। যেমন, ক্লাসে একটা ছবি দেখান হল যে একটা বেড়াল একটা খোলা খাঁচার ভিতরকার পাখীটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। এর দুরকমের বর্ণনা শিশুকে দেখান যেতে পারে—

১। দিদির মেনি বড় দুষ্টু। ঝি পিসিমার টিয়াপাখীর খাঁচা খুলে রেখেছিল। মেনি পাখীকে খাবার চেষ্টা করছিল। মা মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন।

২। আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে একটা কাণ্ড

হয়েছিল। ঝি পিসিমার টিয়াপাখীটাকে খাবার দিয়ে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল, আর সেই অবসরে দিদির পোষা মেনিটা এসে তাকে ধরতে গিয়েছে। ভাগ্যিস মা টিয়াপাখীর চিৎকার আর ডানা-ঝটপট করবার শব্দ শুনে এসে তাড়াতাড়ি মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন, না হলে টিয়াপাখী বেচারা মারাই যেত।

এই দুটি অংশের তুলনা করলে শিশু সহজেই বুঝতে পারবে কোথায় গল্পটি উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে আর কোথায় হয় নি।

একাধিক অনুচ্ছেদসম্পন্ন গল্প লেখা এর পরের স্তর। বিষয়টিকে কি ভাবে, কয় অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে নিতে হবে তা বোঝা শিশুর পক্ষে কঠিন, তাই প্রথমে মুখে মুখে একটা আলোচনা করে নিয়ে বোর্ডে তার কাঠামোটা তুলে দিতে হবে। যেমন একটা ছবিতে যদি থাকে যে দুটি ছেলেমেয়ে মাঠে একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে পেয়েছে, তা হলে এমনি একটা গল্প কল্পনা করে নেওয়া যায় যে, তারা সেটিকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পুষবে। গল্পটির তিনটি ভাগ হল মাঠে কুকুরটিকে পাওয়া, তারপর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া এবং পোষা; এ তিনটি অংশের অনুসরণ করে তিন অনুচ্ছেদে গল্পটি লিখতে হবে, যেমন—

"খুকু আর সোনা দুই ভাইবোন। একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে তারা দেখল একটা ছোট্ট, সাদা ধবধবে কুকুরছানা পড়ে পড়ে কুঁই কুঁই করে কাঁদছে। এই দেখে তাদের এত দয়া হল যে তারা কুকুরছানাটাকে বাড়ী নিয়ে এল।

"মা ছানাটাকে দেখে বল্লেন 'এটা বোধ হয় ভাল জাতের কুকুর হবে।' তিনি ওকে দুধ খেতে দিলেন, আর

একটা ছোট ঝুড়িতে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে নরম বিছানা পেতে দিলেন।

"সেই থেকে কুকুরটা ওদের খেলার সাথী হয়ে রইল। ওরা ওর নাম দিয়েছে—'ঝুমরো'।"

তা ছাড়া পড়বার সময়ে যেমন ছবি ও তার সঙ্গের বাক্য-পরম্পরার সাহায্যে শিশু সম্পূর্ণ গল্প পাঠ করতে পারে, তেমনি লিখবার সময়েও যদি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় তবে অনুচ্ছেদবিভাগ খুবই সহজ হবে। প্রথমে শিশু ছবি ও তার নীচের লেখাগুলি মন দিয়ে পড়ল, তারপর লেখাগুলি সরিয়ে নিয়ে শুধু ছবিগুলি অবলম্বন করে তাকে গল্পটা প্রথমে বলতে তারপর লিখতে বলা হল। শেষে ছবি, লেখা সব সরিয়ে নিলেও শিশু মন থেকে গল্পটা লিখতে পারবে। ছবির পারম্পর্যের সাহায্যে গল্পের পারম্পর্য ও অনুচ্ছেদবিভাগ অতি সহজেই রক্ষিত হবে। ছোটদের কোন কোন মাসিক পত্রিকায় এ রকম মজার গল্প বা কবিতা প্রকাশিত হয় যার প্রত্যেকটি ঘটনার অনুরূপ এক একটি ছবি দেওয়া থাকে। এমনি ছবির ধারা সংগ্রহ করে শিশুদের গল্প রচনা করতে দিলে তারা খুব আনন্দিত হবে; তারপর প্রত্যেকের লেখা ভিন্ন ভিন্ন গল্পগুলির তুলনা করলে পরস্পরের আদানপ্রদানে তাদের ভাবসম্ভার বৃদ্ধি পাবে।

এই ভাবে রচনায় একটু অগ্রসর হলে ছবির সাহায্য বিনাই তারা পূর্বপঠিত গল্প স্মৃতি থেকে লিখে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে শিশু যাতে বইয়ের ভাষা মুখস্থ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক শিক্ষক এ অভ্যাস করান, কিন্তু এর মত হাস্যকর আর বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এতে অনেক সময়ে এক

জায়গায় একটি শব্দ ভুলে গেলে সমস্তটা গুলিয়ে গিয়ে একটা দুর্বোধ্য খিচুড়ি হয়ে যায়। অপর পক্ষে যদি স্বাভাবিক ভাবে বইয়ের ভাষা খানিকটা এসে যায় তবে সেটা এড়াবার দরকার নাই এবং এড়াবার চেষ্টা না করাই উচিত।

প্রথম প্রথম গল্প লেখাবার সময়ে শিশুর পূর্ব পঠিত ও শ্রুত গল্প ক্লাসে আলোচনা করে তার সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখে দিতে হয়, তাই অবলম্বন করে শিশু সম্পূর্ণ গল্পটি বিস্তারিতভাবে লিখবে, এতে তার ভাবধারা সুসজ্জিত থাকবে এবং অনুচ্ছেদ-রচনারও সুবিধা হবে। এই ভাবে একটু অভ্যাস হয়ে গেলে পরে লিখতে আরম্ভ করবার সময়ে সংক্ষিপ্তসারটি মুছে দিতে হবে।

মৌখিক আলোচনাই যে রচনার ভিত্তি এ কথা শিক্ষক যেন কখনও না ভুলে যান। লিখতে আরম্ভ করার আগে আলোচনা করে নিলে ছাত্রের মনে যে ভাবগুলি ভাসা ভাসা ও এলোমেলো হয়ে ছিল সেগুলি স্পষ্ট ও সংবদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ রচনা উৎকৃষ্ট হয়।

রচনাশিক্ষার প্রথমাবস্থায় ভাষার সৌন্দর্যের চেয়ে ভাব-প্রকাশের স্পষ্টতার প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখতে হবে। এত অল্প বয়সে সুসাহিত্য সৃষ্টি করার সম্ভাবনা এত কম যে সে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে পণ্ডশ্রম হবে মাত্র; তার চেয়ে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধভাবে, পারম্পর্য রক্ষা করে, যুক্তিসঙ্গতরূপে (logically) ভাব প্রকাশ করতে পারল কি না সেটা দেখাই বেশী প্রয়োজনীয়। শুধু বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীর নয়, উচ্চশ্রেণীর, এমন কি কলেজেরও ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময়ে স্টাইলের যে হাস্যকর প্রয়াস করে তার দ্বারা ভাব প্রকাশিত

হওয়ার চেয়ে আবৃতই হয় বেশী। তাছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে প্রাঞ্জল ও সরলভাবে ভাবপ্রকাশ করাটাই তার নিজস্ব রীতি হওয়া উচিত। গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতার প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় বলে এই স্তরে শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশের তারতম্যানুযায়ী রচনাশক্তির তারতম্য হয়, বুদ্ধি বা মনীষার তারতম্য এত শীঘ্র ধরা পড়বার কথা নয়।

রচনার প্রথম স্তরে সচেতনভাবে লিখনরীতির সৌন্দর্যের প্রয়াস করতে হয় না বলে এই সময়ে বিষয়বস্তু হয় প্রধান, রচনারীতি বিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত হলেই হল। ক্রমশ ভাবকে গুছিয়ে প্রকাশ করার অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে গেলে তবে ভাষার কারিগরীর দিকে নজর দেওয়া যায়। এইবার যে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত "স্টাইলের" উদ্ভব হবে সেটা ভাষাবিশুদ্ধির ও যুক্তিপরতার দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত। এই ভিত্তি না থাকলে ভাষার ছটার বা অলঙ্কারবহুল বাক্যবিন্যাসের কোন অর্থ থাকে না। অনেক শিক্ষক শিশুর লিখনরীতির উৎকষ সাধন করবার জন্য ভাষার কতকগুলি সুললিত বিশিষ্ট ভঙ্গি মুখস্থ করান, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিমভাবে আহৃত অলঙ্কারসম্ভারের স্মৃতিতে বালকবালিকার কোন লাভই হয় না, তাদের ভাষার সাবলীল গতি ব্যাহত হয় মাত্র। এতে তাদের নিজেদের যে স্বাভাবিক অনলঙ্কৃত রীতি গড়ে উঠতে পারত তার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

ভাষার যে বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি কেবলমাত্র সাধুভাষার অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলি শিখবার শিশুর কোন প্রয়োজন নাই, আর দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে প্রাকৃত বাংলার যে সব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত আছে, যেগুলির দ্বারা তার

ভাষার সত্যকার প্রয়োজন সাধিত হবে, সেগুলি সে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আপনিই শিখে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গির উল্লেখ করা যায়, যেগুলি ছাড়া বাংলাভাষার সম্পূর্ণ ব্যবহারই অসম্ভব, যথা—"করে ফেলা", "দিয়ে দেওয়া", "নিয়ে নেওয়া" ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদ; "দাঁত টাঁত", "ঘোড়া টোড়া", "খাবার টাবার" ইত্যাদি অনুকার শব্দ; "কাপড় চোপড়", "জিনিষপত্র", "বাক্স পেঁটরা" ইত্যাদি শব্দেব দ্বিত্ব; "সোনার বাটি", "কাঠের খেলনা" ইত্যাদি ক্ষেত্রে ষষ্ঠীর প্রয়োগ প্রভৃতি। এগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে যে কণ্ঠস্থ করার পরিবর্তে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এগুলি শেখা কত সহজ।

স্টাইল সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা যায় যে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশু আপনিই সুন্দর লিখনরীতি অর্জন করবে। অনেক ছাত্র সুন্দর ভাষা রচনা করতে পারে না বলে নোটবই মুখস্থ করে। ভাষাশিক্ষার গোড়াপত্তনে দুর্বলতা থাকলে এরকম হয়, কিন্তু বইয়ের ভাষা মুখস্থ করলে লাভ হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতি কতটা হয় সে কথা আগে বলা হয়েছে। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করা ভাষা হয়ত ভুলের দরুণ একেবারে অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হবে না, কিন্তু গুরুচণ্ডালী দোষ যে ঘটবে এ কথা প্রায় নিশ্চিত।

অপর পক্ষে ভাল লিখনরীতি আয়ত্ত করতে হলে আদর্শের প্রভাবের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আদর্শ সজ্ঞানকৃত চেষ্টার দ্বারা অনুকরণীয় নয়, তার প্রভাব ছাত্রের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পড়লেই ভাল হয়। এইজন্য নীচের

ক্লাস থেকে একধারে যেমন রীতির সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, অপরদিকে তেমনি শিশুকে ধীরে ধীরে সুমার্জিত ও সুন্দর লিখনরীতির বশবর্তী করতে হবে। অতি ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যেও এই অজ্ঞানকৃত অনুকৃতির অভ্যাস দেখা যায়। যেমন আড়াইবছরের শিশু যখন বলছে "টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে", কিংবা চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখে জিজ্ঞাসা করছে "এর গায়ে কালো কালো দাগ?" তখন সে নিজেই জানে না যে তার প্রথম উক্তিতে "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ন'দেয় এল বান" এই ছড়ার এবং দ্বিতীয় উক্তিতে "বাদা বনের বুড়ো বাঘ, গায়ে কালো কালো দাগ" এই ছড়ার প্রতিধ্বনি রয়েছে। এই ভাবে যে রীতির সূত্রপাত হল, বড় বয়সে সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তা পূর্ণতা লাভ করবে।

সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনা লিখনরীতি সুন্দর করবার ভিত্তি। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সাহিত্যপাঠ এবং আলোচনা একেবারেই হয় না বলা যায়। বিশেষত বড় বড় লেখকের ভাষার বিশেষত্বগুলির দিকে আমাদের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কখন হয় না। ছাত্রদের দিয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠ ও শ্রবণ করান এক্ষেত্রে শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। তাছাড়া আজকাল ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরও এর আলোচনা থেকে বঞ্চিত না করলেই ভাল। ব্যাকরণ ও রচনার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যরীতির আলোচনা করলে তাদের নিজস্ব রীতিরও উৎকর্ষ সাধিত হবে। স্বয়ংসঞ্চয়ন তাদের এদিকে সাহায্য করবে।

ভাল লিখনরীতির প্রভাব খুব বলবান। এ জন্য শিক্ষকের ভাষা সুন্দর হলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁর ভাষার প্রভাবে ছাত্রদের রীতিও সুন্দর হয়ে উঠবে। এই স্বাভাবিক পথই লিখনরীতির উৎকর্ষসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের চেষ্টা ও অনুরাগ উদ্রিক্ত না হলে চারিদিকের শত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও লিখনরীতির কোনই উন্নতি হবে না। অতএব একান্ত ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ই রীতির উৎকর্ষের প্রথম ভিত্তি।

ভাষাপ্রয়োগের বিশুদ্ধতা স্টাইলের অগ্রগামী, একথা আগেই বলা হয়েছে, কাজেই স্টাইলের প্রসঙ্গে এ বিষয়েরও কিছু আলোচনার দরকার। ভাষার বিশুদ্ধতা লাভের উপায় অভ্যাস (drilling), ব্যাকরণ মুখস্থ করা নয়, তাই অভ্যাসের কয়েকটি ধারার নির্দেশ দেওয়া হল।

ভাষাশিক্ষার প্রথমাবস্থায় শিশুদের কতকগুলি ক্রিয়াপদ দিয়ে উপযোগী কর্তার প্রয়োগ করতে বলা যেতে পারে। যথা, শিক্ষক হয় ত "লাফাচ্ছে", "চেঁচাচ্ছে", "উঠছে", "বসেছে", "লিখছে" প্রভৃতি কয়েকটি কাজের কথা বল্লেন; শিশু তার থেকে—"ব্যাং লাফাচ্ছে", "খোকা চেঁচাচ্ছে", "পাখী উড়ছে" "রাম বসেছে", "যদু লিখছে" প্রভৃতি বাক্য গঠন করবে। এর মধ্যে হয়ত কোন শিশু "রাম উড়ছে" বা "পাখী লিখছে" বা অনুরূপ কোন অপপ্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু শিশুরা যদি সত্যই মনোযোগের সঙ্গে এ খেলায় যোগ দিয়ে থাকে তাহলে তাদের কাছে এ ভুলটির তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যাওয়া উচিত।

এই ভাবে বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রয়োগের অভ্যাস করান যায়; যেমন, শিক্ষক যদি "গাছ", "বাঘ", "কাক", "বরফ",

"কুকুর" প্রভৃতি নাম বলেন তবে শিশুরা তার সঙ্গে "সবুজ", "বড়", "কালো", "ঠাণ্ডা", "ঝাঁকড়া" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারে। এগুলিকে উল্টোপাল্টা করে দিয়ে শিশুর সামঞ্জস্য-বোধের পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন, একটি শিশুকে বলা হয়েছিল, "আমি ঠাণ্ডা চা আর গরম আইসক্রীম খাচ্ছিলাম"—শিশুটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "দুৎ বোকা! গরম চা আর ঠাণ্ডা আইসক্রীম।"

অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে শিশুকে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করতে বলা যেতে পারে; যথা, "কুকুরটা—কামড়েছিল," "রাম—মেরেছিল," ইত্যাদি। অথবা কর্তা ও কর্ম জুগিয়ে দিয়ে ক্রিয়া-পদটা পূরণ করতে বলা যায়; যথা, "বিড়াল ইঁদুর—," "কাঠুরে কাঠ—," "ধোপা কাপড়—" ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত বাক্য দিয়ে শিশুকে বিশেষণাদির প্রয়োগদ্বারা সেগুলিকে বিস্তৃত করতে বলা যায়। যেমন পূর্বলিখিত বাক্য-গুলিকে—"কাঠুরে ভারি কুড়ুল দিয়ে মোটা কাঠ কাটছিল," "ধোপা ভাল সাবান দিয়ে রেশমের কাপড় কাচছিল," "আমাদের পোষা সাদা বেড়াল একটা মেঠো ইঁদুর ধরেছিল" ইত্যাদি ভাবে পরিবর্তিত করা যায়। প্রথম প্রথম শিশু একটি বাক্যকে একেবারে খুব বেশী সম্প্রসারিত করতে পারে না বলে এ কাজ ধীরে ধীরে করতে হয়, যেমন—"এই গাছে গোলাপ ফোটে," এই কথাটিকে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, যথা—"এই গাছে শীতকালে গোলাপ ফোটে," "এই গাছে শীতকালে লাল গোলাপ ফোটে," "এই গাছে শীতকালে অনেক লাল গোলাপ ফোটে," "এই গাছে শীতকালে অনেক বড় বড় লাল গোলাপ ফোটে," "এই গাছে প্রতি শীতকালে ইত্যাদি,"

"এই বড় গাছে ইত্যাদি"—এমনি করে ক্রমান্বয়ে যতদূর সম্ভব বাড়ান যায়। বাড়াবার সময়ে ক্লাসের এক একটি শিশুকে এক একটি করে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে বল্লে অনেকটা খেলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা হবে।

এর মধ্যেও প্রয়োগের উপযোগিতাবিচার চলবে; যেমন, "লাল বেড়ালটা একটা হলদে ইঁদুর ধরেছিল, অথবা "কাঠুরে করাত্ দিয়ে কাঠ কাটছিল" ইত্যাদি অচল।

বাক্য রচনার পরবর্তী স্তর বাক্যপরম্পরা গঠন। "রাম পিঁড়িতে বসে" এবং "রাম ভাত খায়," এই দুটি বাক্য মিলিয়ে হবে "রাম পিঁড়িতে বসে ভাত খায়"। "আমি পুকুরের ধারে গিয়েছিলাম" আর "আমি মাছ ধরেছিলাম" মিলিয়ে হল "আমি পুকুরের ধারে গিয়ে মাছ ধরেছিলাম"। এই ভাবে সংযুক্ত বাক্যের সংখ্যা বাড়িয়ে দীর্ঘ করা যায়, এইই রচনার প্রথম সোপান, তারপর অনুচ্ছেদ ও গল্প।

বাক্যপরিবর্তন বাক্যাভ্যাসের (drilling) দিক দিয়ে খুব কার্যকরী। যেমন শিক্ষক একটি শিশুকে আদেশ দিলেন "দরজা বন্ধ কর," তারপর তিনি অপরকে জিজ্ঞাসা করবেন "আমি অমুককে কি বল্লাম?" সে উত্তর দেবে "আপনি অমুককে দরজা বন্ধ করতে বল্লেন।" এইরূপ অংশ যদি দীর্ঘ হয় তবে কাগজে লিখে তার পরিবর্তন করতে হবে। এতে রচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও শেখা হয় অথচ চোখের জল পড়ে না।

কোন গল্পের বচন, কাল ইত্যাদির পরিবর্তন করে লেখানও খুব ভাল অভ্যাস। যেমন গল্পটা যদি হয় যে "রামের একটা পোষা কুকুর ছিল, সে সেটাকে এমনভাবে শিখিয়ে নিয়েছিল যে তাকে পয়সা দিলে দোকান থেকে মিঠাই কিনে আনত।"

রামের কুকুর থাকার ব্যাপারটিকে বর্তমানকালে নিয়ে এসে গল্পটির ভাষায় কিছু পরিবর্তন করা যায়, কুকুরটা যদি রামের না হয়ে আমার হয় তবে আর এক ভাবে পরিবর্তন হবে, আবার "যদি আমার এরকম কুকুর থাকত" এমন একটা ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে পরিবর্তনটি তৃতীয় আর এক রকমের হবে।

একটু বড হলে কবিতা অবলম্বনে গল্প রচনা করান যায়। এতে কবিতার ভাষার ছটার ভেতব থেকে মূল গল্পটি বেছে নিয়ে প্রকাশ করাতে ভাষার সরলতা ও ভাবের প্রাঞ্জলতার অভ্যাস হয়। তা ছাড়া কবিতাব ভাষার প্রভাবে লিখনরীতিও কিছুটা অর্জিত হতে পারে।

পরীক্ষার খাতায় কয়েকপ্রকারের রচনার প্রশ্নের খুব প্রচলন দেখা যায়, যেমন, ব্যাখ্যা, অর্থপ্রকাশ বা ভাষান্তর (paraphrase), সারার্থ (summary), ভাবার্থ (substance), ভাব-সম্প্রসারণ (amplification) ইত্যাদি।

এর মধ্যে ভাষান্তরের ব্যবহার বাংলা পদ্য ভিন্ন গদ্যে বিশেষ নেই, এবং এর উপকারিতাও বেশী নয়। এর একমাত্র উপকার এই যে যেস্থলে অর্থবোধ কঠিন সেস্থলে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনেক সময়ে সহজে মানে বোঝা যেতে পারে। তা ছাড়া শিক্ষক যখন পাঠ্যবিষয় বিবৃত করেন তখনও অনেক সময়ে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নেন। কিন্তু এর মারাত্মক দোষ এই যে এইভাবে অর্থপ্রকাশ করতে গিয়ে বালকবালিকা মূলের প্রতিটি শব্দের পরিবর্তে এক একটি করে অনুরূপ শব্দ বসিয়ে যেতে চায় বলে অনেক সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ভুল ঘটে এবং সাহিত্যের সমগ্র দৃষ্টির হানি হয়। এই জন্য এর সামান্য উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ক্লাসের কাজ হিসাবে এর ব্যবহার না করলেই ভাল।

পাঠ্যপুস্তক বা বাইরের কোন সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করবার জন্য দেওয়া যেতে পারে। দুইয়ের সাধারণ প্রকৃতি এক, তবে পাঠ্যপুস্তক থেকে অংশ তুলে ব্যাখ্যা করতে দিলে লেখকের নাম এবং অংশটির কিছু পূর্বাপর পরিচয় দিতে হয়। এই পরিচয় (context) প্রথমে দিয়ে তবে মূল ব্যাখ্যার আরম্ভ হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঠিক যতটা প্রয়োজন ততটা পরিচয় দেওয়া পূর্বপরিচয় প্রদানের রীতির আদর্শ। মূলের ব্যাখ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপর ব্যাখ্যা অংশের উৎকর্ষ নির্ভর করে। অনেকে মূল ব্যাখ্যার মধ্যে সব কথা বলতে না পেরে পাদটীকা সংযুক্ত করে দেন। অনেক আদর্শ ব্যাখ্যার বইয়েও এই রীতি দেখান হয়েছে। কিন্তু এতে সাহিত্যসৌন্দর্যের হানি হয়; যদি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে ব্যাখ্যা রচনা করা যায় তবে টীকার প্রয়োজন হয় না। নির্বাচনক্ষমতা, যুক্তি-যুক্ততা, প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি ক্ষমতার বিকাশ করে বলে ব্যাখ্যা অংশের মূল্য খুব বেশী।

সারার্থ ও ভাবার্থের প্রকাশ অনেকটা এক ধরণের কাজ, কেবল প্রথমটিতে সমগ্র বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয় আর দ্বিতীয়টিতে মূল ভাবটিকে প্রকাশ করা চাই। সংক্ষেপে, সোজাভাবে রচনার অভ্যাস হয় বলে এই প্রক্রিয়া মূল্যবান।

ভাবসম্প্রসারণ (amplification) অনেকটা প্রবন্ধজাতীয়; এতে নির্ধারিত অংশ অবলম্বন করে বালক নিজ মনের ভাব প্রকাশ করে, বিষয়বহির্ভূত না হলে বাইরের কথা এর মধ্যে স্থান পেলে ভাল। এতে এবং ব্যাখ্যায় সম-উক্তিসঙ্কলনের প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন কোনটি অভ্যাসের

দিক দিয়ে মূল্যবান হলেও সাহিত্যবোধ বা আলোচনার বিশেষ সাহায্য করে না।

অনুবাদের আলোচনা করে এই পরিচ্ছেদ শেষ করা যায়। ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করে যতদূর আক্ষরিক অনুবাদ করা যায় তত ভাল, যে অংশের আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব নয় সেই অংশের ভাবানুবাদ করতে হবে। নীচের ক্লাসে অনুবাদের স্থান না থাকাই ভাল। উপরের ক্লাসে ভাষাব্যবহারের অভ্যাসের (drill) জন্য অনুবাদ করান যায় কিন্তু প্রক্রিয়া হিসাবে এর মূল্য বড় বেশী নয়। অবশ্য বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রচলন হওয়াতে ভবিষ্যতে এই অভ্যাস হয় ত উপকার করতে পারে।

শেষ কথা এই যে এই সমস্ত লেখার কাজ করবার জন্য যে মূল পদ্যাংশ তুলে দেওয়া হয় সেগুলি সুনির্বাচিত হলে তাব মধ্যে দিয়েই শিক্ষা এবং সাহিত্যপরিচয় হতে পারে। ভাবময় কবিতা, সাময়িক ঘটনার উল্লেখপূর্ণ গদ্যাংশ বা শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার অংশ উদ্ধৃত কবে দিলে সাধারণজ্ঞান ও সাহিত্যানুবাগের বৃদ্ধিব সহায়তা হবে।

প্রবন্ধ-রচনা

শিশুকে প্রবন্ধ লিখতে দেবার সময়ে প্রথমেই মনে হয় 'কি লিখতে দেব ?' যে বিষয়ের উপর শিশুর দখল আছে, যা লিখতে তার ভাল লাগে, সেই বিষয়েই তাকে লিখতে দেওয়া সমীচীন, কেননা সে যা জানে এবং ভালবাসে তারই বর্ণনা উজ্জ্বলভাবে করতে পারবে। শিক্ষাতত্ত্বের নিয়মে জানা থেকে অজানার প্রতি যাওয়ার যে বিধি আছে তার অনুসরণ করে অনেকে স্কুলের ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার অথবা গরু ঘোড়া ইত্যাদি পরিচিত বস্তু এবং জীবজন্তুর বিবরণের উপর প্রবন্ধ রচনার ভিত্তি স্থাপন করার পক্ষপাতী ; এতে শিক্ষার একটি মূলসূত্র রক্ষিত হয় বটে কিন্তু শিশুমনের সৃজনীশক্তিকে উৎসাহিত করা মোটেই হয় না। বড়রা জানেন, জানা গল্প কাউকে দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়াস কিরূপ বিড়ম্বনাময়, অতি পরিচিত অতি সাধারণ বিষয়ের বর্ণনা করতে দিয়ে শিশুকে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত করা হয়। সে হয়ত সেদিন রাস্তায় দুটি গাড়ীর ধাক্কা লাগতে দেখেছিল, হয়ত পাশের বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে তার মারামারি হয়েছিল, হয়ত খাট থেকে পড়ে গিয়ে তার ছোট বোনটি মাথায় চোট পেয়েছে, এবং এইসব কথাগুলিই প্রকাশ পাবার জন্য তার মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছে ; ঠিক সেই সময়ে গরুর দুটি শিং বা ডেস্কের চারটি পায়ার বিবরণ লেখা যে তার পক্ষে কতটা নিরুৎসাহজনক তা বলাই বাহুল্য। দুই ক্ষেত্রেই যখন ভাষার অভ্যাসের সমান

সুযোগ রয়েছে, বরং দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাতেই বর্ণনার উজ্জ্বলতার সম্ভাবনা অধিক, তখন দ্বিতীয় ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে শিশুকে লিখতে দেওয়াই ভাল। যদি বলা যায় যে প্রথমোক্ত প্রকারের রচনায় জ্ঞানেব উন্মেষ ও ভাষার বিকাশ একসঙ্গে হয়, তার উত্তর এই হবে যে প্রবন্ধ-রচনার স্তবে পৌছাবার আগেই এই শ্রেণীব জ্ঞান শিশুর আয়ত্ত হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির অভ্যাস প্রবন্ধ-রচনাব মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞান-লাভটা উপরি পাওনা, কাজেই জ্ঞান-লাভ করতে গিয়ে প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষের হানি ঘটলে সে জ্ঞান-লাভকে বাঞ্ছনীয় বলা যায় না।

বিদ্যালয়েব উচ্চশ্রেণীতেও প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচন সাধারণত ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে। সদাশয়তা, মহানুভবতা, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণেব বর্ণনা নিয়ে প্রবন্ধ বচনা করা ডেস্ক, বেঞ্চ ইত্যাদি নিযে লেখাবই মত নীরস, তাব উপর আবাব এগুলির সম্বন্ধে বালকেব মনেব ধারণা স্বভাবত অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে থাকে। তার চেয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, ভ্রমণেতিহাসের নানা কাহিনী নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে দিলে তাদের আগ্রহ অনেক বেশী বাড়বে; যেমন কোন ছেলে হয়ত ছাপাখানা, সাবানের কারখানা, বা অন্য এমন কোন জায়গা দেখে এসেছে যা অন্যরা দেখেনি, বা এমন দেশে বেড়িয়ে এসেছে যেখানে অন্যরা যায়নি, সে তার বর্ণনা খুব ভাল করে করতে পারবে। তাছাড়া স্থানীয় কোন বিশেষ ঘটনা, যেমন কোন মেলা, সভা বা খেলার বর্ণনা করতে বালক উৎসাহ পাবে, এবং কিছুদিনের মধ্যে এইগুলি অবলম্বন করে উক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করে তার জ্ঞান প্রসার লাভ করবে।

যে সব মামুলি বিষয় ইস্কুলে চলে এসেছে যদি সেগুলি অবলম্বন করে প্রবন্ধ লিখতেই হয় তবে নূতনভাবে লেখান উচিত। যেমন নাচের ক্লাসের ছেলেকে যদি গরু বা ডেস্কের বিষয়ে সাধারণ বর্ণনাত্মক প্রবন্ধ লিখতে না দিয়ে একটি বিশেষ গরুর গল্প বা বিশেষ ডেস্কের বর্ণনা লিখতে দেওয়া হয় তাহলে সে একাজ বেশ উৎসাহের সঙ্গে করবে। তেমনি উপরের ক্লাসেও কোন গুণ নিয়ে নির্ব্যক্তিক আলোচনা না করিয়ে যদি বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে দিয়ে গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে দেওয়া হয় তাহলে তারা খুব আনন্দের সঙ্গে লিখবে। যদি এর মধ্যে সুযোগ্য উদাহরণ সংগ্রহে প্রতিযোগিতার ভাব থাকে তবে উৎসাহ আরো বেড়ে যাবে।

অন্য সকল প্রকার রচনার মত প্রবন্ধ রচনার পূর্বেও নির্দিষ্ট বিষয়টি অবলম্বনে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিষয়টির সম্বন্ধে ছাত্রের যেটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তাকে সুসজ্জিত ও পর্যায়ভুক্ত করে দেওয়া এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে শিশুমনে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ঘটে তার ফলস্বরূপ উদ্ভূত চিন্তাগুলি সাধারণত মনের সচেতনলোকে উত্তীর্ণ হতে না পেরে অবচেতন সত্তায় লুকিয়ে থাকে, অথবা সচেতনলোকে উপনীত হলেও প্রবন্ধাকারে সজ্জিত থাকে না। এই কারণে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবার পূর্বে শিশুর মস্তিষ্কের অন্তর্গত জ্ঞানকে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার এবং সেই কাজ শিক্ষকের প্রশ্নের দ্বারা সাধিত হবে। এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে হবে যে শিশুর অবচেতনলোকের চিন্তাগুলি চেতনালোকে আকৃষ্ট হয়ে সজ্জিত হয়ে যাবে। প্রশ্নপরম্পরার দ্বারা ছাত্রদের

দিয়েই প্রবন্ধের কাঠামো (outline) তৈরী করিয়ে নিতে হবে। সেটি বোর্ডে লেখা থাকলে ছাত্রদের সামনে সমগ্র বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার স্পষ্টরূপে ধৃত হবে। ছাত্রেরা প্রবন্ধ রচনার সময়ে এটি ব্যবহার করতে পারে অথবা নিজেদের কাঠামো তৈরী করে নিতেও পারে।

যেমন রেলস্টেশন প্রত্যেক বালকের অতি পরিচিত বিষয়, কিন্তু তবু তার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে গেলে অনভ্যস্ত চিন্তাধারার খেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই শিক্ষক হয়ত প্রথমে প্রশ্ন করবেন তার ছাত্রেরা রেলস্টেশন দেখেছে কি না, এবং তার উত্তরের উপর ভিত্তি কবে শিশুদেব দ্বাবাই সেখানকার রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম, আপিস, গাড়ার আনাগোনা প্রভৃতি নানা কথা বিবৃত কবিয়ে নিতে পাবেন; তারপব স্টেশনের এবং সেখানকার লোকজনের বর্ণনা, বড ও ছোট স্টেশনের তুলনা, স্টেশনের অবস্থিতি প্রভৃতিব আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধেব বিষয় সম্পূর্ণ হবে; এই সমস্তই শিশুদের জানা কথা এবং তারা নিজেরাই শিক্ষকের নির্দেশানুযায়ী বিবৃত করতে পারবে। শিশুমনে যা ঝাপসা ছিল তাকে স্পষ্ট করবার জন্য এবং যা এলোমেলোভাবে ছড়ান ছিল তাকে সজ্জিত করবার জন্য শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন।

প্রবন্ধের বিষয়ের আলোচনার অব্যবহিত কাল পরেই সেটা লিখতে দেওয়া উচিত নয; কেননা শিক্ষক ছাত্রেব কাছ থেকে তার যে সর্বোত্তম প্রয়াস, তার প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গির যে মার্জিত রূপ, আকাঙ্ক্ষা করেন তার বিবর্তন সময়সাপেক্ষ। এই জন্য আলোচনা ও লেখাব মাঝখানে কয়েকদিন ফাঁক রাখা শ্রেয। ছাত্রদের নির্দিষ্ট বিষয়ের বই ও প্রবন্ধের সন্ধান বলে

দিলে তারা ইতিমধ্যে সেগুলি পড়ে নিতে পারবে। এই সময়ে ক্লাসের পড়ায় যদি কোন সম্পর্কিত বিষয়ের উত্থাপন হয় তবে শিক্ষক তার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে দিতে পারেন। এমনিভাবে ছাত্রদের মনের মধ্যে ভাবগুলি যত পরিপক্ব হতে থাকবে সম্পূর্ণ প্রবন্ধের ধারণাটি তাদের মনে তত সুন্দরভাবে গঠিত হতে থাকবে এবং প্রবন্ধ লেখার দিন তার সমগ্র জ্ঞানটি সুসজ্জিত ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু এত খেটে, সুন্দর করে প্রবন্ধ লেখার মূলে একটা প্রেরণা চাই। ছাত্র যেন তার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করে। শিক্ষক বা অন্য কেউ সত্যকার আগ্রহের সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠ করলে তার মনে সাফল্যের ভাব আসবে এবং সে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-লাভে প্রয়াসী হবে। আগ্রহ ও সহানুভূতিই ছাত্রের আসল পুরস্কার; কাজেই শিক্ষক যদি বেছে বেছে প্রত্যেক বিষয়ের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বিদ্যালয়ের পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করেন; অথবা যদি সেই প্রবন্ধের রচয়িতাকে তার সংগৃহীত চিত্রাদির সহযোগে নীচের শ্রেণীর ছেলেদের কাছে বিষয়বস্তুটিকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করবার সুযোগ দেওয়া যায় তবে এরূপ মৌলিক কাজ খুব উৎসাহ পাবে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ও আলোচনারীতির জটিলতার তারতম্যানুযায়ী কোন কোন ক্লাসে কি কি ধরণের প্রবন্ধ লেখান যায় তার একটা ক্রম নির্দেশ করা হয়। যেমন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে, যখন শিশু গল্প লিখতে শিখে প্রথম প্রথম প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করছে, তখন তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু গল্পের মতই সরল ও সরস হওয়া উচিত; যথা, তার পোষা কুকুরের বর্ণনা কিংবা তার গত জন্মদিনের আমোদপ্রমোদের বিবরণ

ইত্যাদি। এই বয়সের শিশু তার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে গল্প বলতে ভালবাসে বলে তার অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করতে পেলে খুসী হবে। এই ধরণের প্রবন্ধ লেখা সবচেয়ে সহজ, কেননা, এতে ঘটনাবলীর একটা সুনির্দিষ্ট ক্রম থাকে বলে কেবল ভাষার ভঙ্গির প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারলেই যথেষ্ট হল।

বিষয়বস্তু ক্রমশ জটিল হতে থাকবে। যে শিশু একটি ঘটনার বিবরণ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিল সে হয়ত কিছু দিন পরে পূজার ছুটির আমোদপ্রমোদ সম্বন্ধে এমন প্রবন্ধ লিখবে যাতে ঘটনাবলীর ক্রমানুযায়ী বিবৃতির সঙ্গে তার দেখা জায়গাগুলির বর্ণনা মেলানো থাকবে। আবাব আরো কিছুদিন পরে সে সেই স্থানসমূহের ভূতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতিব সম্বন্ধে আলোচনা কবতে পারবে।

তারপর ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনায হস্তক্ষেপ করবে। শুধু ঘটনা বা বর্ণনার উপব এ জাতীয় প্রবন্ধ দাঁড়াতে পাবে না, এতে বালকের আলোচনা, আহরণ ও সাধাবণ জ্ঞানের পরিচয় চাওযা হয। আমাকে একবার বিমানপোতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনার একটি ক্লাস পরিদশন করতে হয় (৫ম শ্রেণী)। ক্লাসে ইতিহাসের ক্রমানুযায়ী বিমানপোতের বিবর্তনের ঘটনাগুলি বিবৃত করা হল, কিন্তু এই বিবরণ শিশুর কাছে অর্থহীন, কেননা উন্নতি কি ভাবে সাধিত হল তার বৈজ্ঞানিক তথ্যের সারমর্ম না বুঝিয়ে দিলে তার কৌতূহলী মন নীরস ঘটনা নিয়ে কিছুতে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। এই ধরণের প্রবন্ধকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হলে উন্নতির প্রত্যেক স্তরের বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা ভিন্নও অতীত ও বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতেরও কিছু নির্দেশ দিতে

হবে। এরূপভাবে প্রবন্ধ রচনার অভ্যাসের দ্বারা বালকের চিন্তাশক্তি দূরদর্শিতা ও কল্পনার সম্যক বিকাশ হয়। বিজ্ঞান আজকাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে বলে ছেলেরা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও লিখবে এবং এর জন্য শুধু যে বই বা ছবির সাহায্য নেবে তা নয়, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে অথবা ভূগোলের ঘরে সে স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগ পাবে।

বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উঠে তবে বালকবালিকারা যুক্তি বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন, কারণ এতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যে কোন বিষয়ের উভয় দিক দর্শন করবার ক্ষমতার প্রয়োজন। এ কাজ শুধু বালকের পক্ষে নয়, পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও অতি কঠিন, প্রায় অসম্ভব। এইরূপ বিষয় প্রবন্ধরচনার জন্য নির্দিষ্ট হলে বালক যাতে একটি বিশেষ মতের দ্বারা পরিচালিত না হয় সে দিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং একই বিষয়ে বিভিন্ন মতের পাঠ ও আলোচনার দ্বারা তাকে বিশেষ করে প্রস্তুত করে নিতে হবে। যেমন. কোন সাময়িক ঘটনার আলোচনা করতে হলে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত একই ঘটনার বিভিন্নরূপ বিবৃতির তুলনা খুব কার্যকরী হয়। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের নির্দিষ্ট অংশ কেটে পাশাপাশি নোটিসবোর্ডে লাগিয়ে দিলে ছাত্রদের পক্ষে তুলনা করা সহজ হবে। এতে বালকের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত, মতামত পরিপক্ক ও দৃষ্টি উদার হবে।

শুধু ঘটনার বা পরিস্থিতির নয়, নির্বস্তুক ভাববিষয়েরও উভয়পক্ষদর্শন ছাত্রের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যথা, ভদ্রতা বা বিনয়ের বিষয়ে প্রবন্ধরচনার সময়ে গুণগুলির প্রশংসার

সঙ্গে তার অতিরেকের দোষ দেখাতে হবে, অথবা "অর্থমনর্থম্" এই প্রবন্ধের মধ্যে এও দেখিয়ে দিতে হবে যে পবিমিত অর্থ সুব্যয়িত হলে অনর্থের মূল হবার কোন কারণ নাই।

প্রবন্ধরচনার বিষয় যেমন মৌলিক ও চিত্তগ্রাহী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি লিখবার ভঙ্গিও সবস হওয়া চাই। যে কোন বিষয়ই সুলেখকের হাতে পড়লে স্থায়ী সাহিত্যের আসন গ্রহণ কবতে পারে, প্রবন্ধও গল্প বা কবিতার মত মনোরম হতে পারে, এইখানেই প্রবন্ধবচনার আসল বাহাদুরী। শিশুকে গল্পলেখার ক্রমবিকাশহিসাবে প্রবন্ধরচনায় ব্রতী করালে স্বভাবতই তার প্রবন্ধে গল্পের সুন্দর ভঙ্গি এসে যাবে; তা ছাড়া শিক্ষক যদি প্রবন্ধেব বিষয়বস্তুর মৌলিকতা ও চিত্ত-গ্রাহিতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন তা হলে বালক মনে যে আনন্দ ও ভরসা পাবে তাই তাকে সাবলীলভঙ্গিতে প্রবন্ধরচনায় সক্ষম করবে।

তবু, শত চেষ্টা সত্ত্বেও হয় ত দেখা যাবে যে এক একটি ছেলে কিছুতেই তেমন স্বাভাবিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, যে বালক প্রবন্ধের নির্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ভাল করে আত্মপ্রকাশ করতে পারল না, তার বক্তব্য চিঠির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে দিলে সেই স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত ক্ষেত্রে সে হয় ত প্রতিভার পরিচয় দেবে। চিঠি ও প্রবন্ধের মূলগত প্রভেদ এই যে প্রবন্ধের রীতি সাধারণত নির্ব্যক্তিক ও আলোচনাময় এবং চিঠির রীতি ব্যক্তিগত ও বন্ধুর আলাপের মত বিশ্রব্ধ। এইজন্য উৎকৃষ্ট পত্ররচনা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনা অপেক্ষা কঠিন হলেও অনেক সময়েই বালকবালিকার কাছে বেশী অভ্যস্ত বলে বেশী সহজ মনে হয়।

অন্যান্য রচনার প্রসঙ্গে রীতি সম্বন্ধে (style) যা বলা হয়েছে প্রবন্ধের বিষয়েও সে কথা খাটে। অন্যের অনুকৃত, মুখস্থ করা, সচেষ্ট রীতি কোন দিন সাহিত্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না; নিজের সরল, সোজা, যুক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ভাষায় নিজের ভাবপ্রকাশের অভ্যাস থেকে ক্রমশ ছাত্রের ব্যক্তিগত রীতি আত্মপ্রকাশ করে। তার উপর শিক্ষক বা কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ভাষার প্রভাব কিছু নিশ্চয়ই বিস্তৃত হবে, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে তা ঘটলে বালকের ভাষার সাবল্য, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততা বাধা পাবে না।

বিষয়বস্তু যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত করা প্রবন্ধের প্রাথমিক প্রয়োজন, তারই দৃঢ়ভিত্তির উপর রীতির সৌন্দর্য ও সরসতা আশ্রয় পাবে। গল্প লিখবার সময়ে যেমন করে অনুচ্ছেদ গঠনের মধ্য দিয়ে গল্পের ধারা অনুসরণ করতে শেখান হয়েছিল, প্রবন্ধের বিষয়টিকে সুসজ্জিত করে নেওয়া তার চেয়ে কিছু কঠিন, কেন না সব প্রবন্ধবিষয়ের ক্রম সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা থাকে না। তবে এক এক ধরণের প্রবন্ধের বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলির আলোচনা করে নিয়ে তদুপযোগী ক্রম নির্দিষ্ট করে নিতে নিতে অভ্যাসক্রমে এ কাজ ছাত্রদের পক্ষে সহজ হবে।

বিষয়পরম্পরা সজ্জিত করার সময়ে যুক্তিযুক্ততা রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিষয়ের অংশ থেকে অংশান্তরে যাওয়ার পথটি যেন সুগম হয়। নূতন অনুচ্ছেদ আরম্ভ করার সময়ে পূর্বানুচ্ছেদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন না করে ভাবপরিবর্তনের প্রথা বিশেষ অভ্যাসসাপেক্ষ।

পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধন

ভ্রমসংশোধন শিক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রচেষ্টা ও ভ্রমের পদ্ধতিকে (Trial and Error Method) শিক্ষার অন্যতম পন্থা বলে নির্দেশ করেছেন। মানুষ বারে বারে ভুল কবতে করতে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে প্রকৃত পথ খুঁজে পায়। ছোট শিশুর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য কবলে শিক্ষার এই পদ্ধতি সহজেই চোখে পড়ে। হয় ত কোনরকমে তার দুটি খেলনা এক সঙ্গে আটকে গেছে, কি করে খুলতে হয় সে জানে না, তাই জিনিষদুটিকে ধরে সে খুব জোরে ঝাঁকাতে থাকে; তারপর সেই ঝাঁকানির চোটেই হয় ত হঠাৎ খেলনা দুটি খুলে আলগা হয়ে যাবে। কিন্তু এতে যে শুধু তার কাজটা করতে খুব দেরী হল তা নয়, কাজটা আকস্মিকভাবে হয়ে যাওয়াতে সেটা করবার পদ্ধতি শিশুর ভাল কবে আয়ত্ত হল না।

তবু মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার ক্ষমতা যাতে না নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্য শিশুকে জ্ঞানের কথাগুলি সোজাসুজি না শুনিয়ে দিয়ে খানিকটা স্বচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করতে দিতে হয়। তা ছাড়া চুপ করে বসে শোনাটা শিশুর স্বভাববিরুদ্ধ. সে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তির উত্তেজনায় সমস্তক্ষণ একটা কিছু করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, তাকে চুপ কবে শুনতে বল্লে হয় ত একবর্ণও তার মাথায় ঢুকবে না কিন্তু কাজের মধ্যে দিয়ে তথ্যটিকে লাভ করতে হলে উৎসাহের সঙ্গে জানবার চেষ্টা করবে। শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন এইখানেই। নূতন

জিনিষ আবিষ্কার করবার সময়ে সন্ধান করবার পথটি জানা থাকে না বলে অনাবশ্যক ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করতে করতে প্রকৃত পথ খুজে নিতে হয়; কিন্তু পূর্বাবিষ্কৃত জিনিষ পুনরাবিষ্কার করবার সময়ে শিক্ষক পথনির্দেশ করে দিলে কাজটি অনেক সহজ হয়। তবে শিক্ষকের নির্দেশ সত্ত্বেও শিশুর কাজ সম্পূর্ণরূপে নিরবদ্য হয় না, এইখানেই শিক্ষককে ভ্রম-সংশোধন করে প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিতে হবে।

সাধারণত ছেলেরা যে সব ভুল করে থাকে সেগুলিকে মোটামুটি কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রকাশভঙ্গির ভুল, ভাষার ভুল, ছেদচিহ্নপ্রয়োগের ভুল, ব্যাকরণের ভুল এবং বানানের ভুল।

প্রকাশভঙ্গির ভুলের মধ্যে ধারাবাহিকতার খণ্ডন এবং অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষা লেখা প্রধান। প্রবন্ধের পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদসমূহের সংযোগরক্ষা সম্পর্কে প্রথমোক্তটির উল্লেখ ও আলোচনা হয়েছে রচনার পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদ রচনাশিক্ষার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক ভাষার প্রয়োগ খুব সাধারণ ভ্রম, এবং এতে ভাবের প্রকাশ ব্যাহত হয় বলে শুধু বিদ্যালয়ের রচনা বা পরীক্ষার খাতায় নয়, পরবর্তী জীবনেও এই অভ্যাস মানুষের অনেক দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য এর আমূল সংশোধন আবশ্যক। শিশুকাল থেকে স্পষ্ট-ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত থাকলে এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমে যাবে, তবু মাঝে মাঝে যখন এরূপ ঘটবে তখন সংশোধনের সময়ে সেই অংশের বক্তব্য বিষয়টি ক্লাসে মুখে মুখে আলোচনা করে নিলে ছাত্রের মনের ভাবটা পরিষ্কার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও অনেকটা স্পষ্ট হবে।

ভাষার ভুলের মধ্যে চলিত ও সাধু ভাষার মিশ্রণ, গুরুচণ্ডালী দোষ, একই ব্যক্তির বিষয়ে "সে" ও "তিনি" এই উভয় পর্যায়ের সর্বনামের প্রয়োগ, বচন ও লিঙ্গের গোলমাল প্রভৃতি সাধারণ। এর মধ্যে শেষ তিনটির মূল ভাষাজ্ঞানের অভাব নয়, অনবধানতা, তাই এর সংশোধন আলোচনার দ্বারা অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। প্রথমোক্ত দুই প্রকারের ভুল ভাষার উপর অসম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত। শিশুর কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার এত পার্থক্য যে কৃত্রিম সাধুভাষার উপর অসামান্য কর্তৃত্ব না থাকলে মিশ্রণ ঘটাই স্বাভাবিক। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, পরিণতবয়স্ক লেখকদের মধ্যেও এই দোষ দেখা যায়। নীচের শ্রেণীতে পুরোপুরি চলিত ভাষায় লেখাতে আরম্ভ করে, সেই ভাষাকেই ধীরে ধীরে মার্জিত করে সাধুভাষাব স্তরে নিয়ে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবু দু'একজন এমন ছাত্র-ছাত্রী দেখা যাবে যারা কিছুতে সাধুভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারবে না, তাদের চলিত ভাষাতেই লিখতে দেওয়া সমীচীন; বিশেষত আজকাল যখন বিশ্ববিদ্যালযের পরীক্ষায় চলিত ভাষায় লিখিত উত্তরও গৃহীত হয় তখন সাধুভাষায় লিখবার জন্য পীড়ন করা অনাবশ্যক।

ছেদচিহ্ন-প্রয়োগের ভ্রম সাধারণত দুই প্রকারের দেখা যায়, ছেদচিহ্নের অভাব এবং "ড্যাশ" চিহ্নের অতিরিক্ত প্রয়োগ। এই বিষয়ের একটি শৈশবস্মৃতি আমার মনে স্পষ্ট উদিত হয়; আমার দুর্ভাগ্য অথবা দুর্মতিক্রমে সর্বদাই দাঁড়ির প্রয়োগে ভুল হয়ে যেত, এবং তার সংশোধনের সময়ে শিক্ষক যখন সমস্ত রচনাটি এক নিশ্বাসে পড়বার চেষ্টায় মুখ রক্তবর্ণ করে ফেলতেন তখন লজ্জায় লুকোবার স্থান পেতাম না। ছাত্রের অনুচ্ছেদ-

রচনার শিক্ষা যদি যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে হয়ে থাকে তবে ছেদচিহ্নের ভ্রমের সম্ভাবনা অনেক কম হবে। তা ছাড়া ছেদচিহ্ন প্রয়োগের শিক্ষার একটা ক্রম আছে। সবচেয়ে ছোট ছেলেপিলেকে দাঁড়ি আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন প্রযোগ শেখাবার দরকার নেই। তারপর কমা এবং এগুলির অভ্যাস পাকা হলে পর প্রয়োজন মত, ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে অন্যান্য প্রযোগ শেখাতে হবে। "ড্যাশ"এর একটা চিহ্ন বলে গৃহীত না হওযাই উচিত। দু'এক ক্ষেত্রে এই চিহ্নের সামান্য প্রয়োজন থাকলেও এর অপপ্রযোগের সম্ভাবনা এত অধিক যে ছাত্রদের মধ্যে এর ব্যবহার বন্ধ করাই ভাল।

ব্যাকরণের শিক্ষাদ্বারা ব্যাকরণগত ভুলের সংশোধন সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জ্ঞানই বিশুদ্ধ ভাষা রচনার ভিত্তি। অভ্যাসের কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা (রচনার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই ভিত্তি বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে স্থাপিত হতে থাকে। ব্যাকরণের ভুল হলে ব্যবহারের দ্বারা তার সংশোধন করতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা সেই সংশোধিত রূপ মনে গেঁথে দিতে হবে। যদি লঙ্ঘিত সূত্রটি পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকে তবে সংশোধন ও অভ্যাসের পরে সেই সূত্রের প্রতি নির্দেশ করে দিতে হবে।

বানানের ভুলের আলোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণত শ, ষ, স অথবা ইকার এবং উকারের প্রয়োগসম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশী ভুল ঘটে। তা ছাড়া প্রায় যে-কোন শব্দেরই বানান ভুলের সম্ভাবনা আছে, যথা—'প্রভৃতি-প্রিভিতি,' 'ভ্রাতা-ভাতা,' 'সাহায্য-সাহার্য্য' ইত্যাদি। এগুলির একটি তালিকা হওয়া দরকার; তা হলে ভুলগুলিকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে ফেলে

তার সংশোধন সহজ হবে। বাংলায় সংস্কৃতসম শব্দগুলির বানানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে কিন্তু প্রাকৃত শব্দের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই বল্লেই হয়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক বানানপদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সাহিত্যে বানানের অরাজকতার ফলে ছাত্রেরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। শিক্ষক নিজের একটি আদর্শ গড়ে নিয়ে সংশোধন, ব্যবহার ও অভ্যাসের দ্বারা যথাসম্ভব বানান-শুদ্ধির চেষ্টা করবেন, বাকিটা ভাগ্যের হাতে। যতদিন না বাংলাভাষায় প্রকাশিত সব বই বানানেব একটি সাধারণ নিয়ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় ততদিন এমনিই চলবে।

ভ্রম সংশোধনের সবচেয়ে ভাল উপায় ভুলকে এড়িয়ে চলা, তাতে সময় ও পরিশ্রম বাঁচে এবং মানসিক শক্তিও বজায় থাকে। অনেকে ভ্রম এড়াবার জন্য ব্যাকরণ বা রচনার বইয়ে শুদ্ধাশুদ্ধ রূপের তালিকা দিয়ে দেন, কিন্তু এ পদ্ধতি বড় অনিষ্টকব। দুটি রূপ পাশাপাশি দেখতে দেখতে তার মধ্যে কোন্‌টা বিশুদ্ধ এ সম্বন্ধে ছাত্রের মনে খটকা লেগে যাবে। তার চেয়ে অশুদ্ধ রূপ না দেখিয়ে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ রূপগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে রাখলে অশুদ্ধ রূপটি ছাত্রের কাছে অনভ্যস্ত বলে এত দৃষ্টিকটু মনে হবে যে তার ব্যবহার সে করবেনা।

ভ্রম এড়াবার কোন সহজ পদ্ধতি না থাকলেও কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা ছাত্রের ভ্রমের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়। রচনাবিষয়ের আলোচনার সময়ে ভাষার বিশুদ্ধির প্রাধান্য এবং তার অভ্যাসের কতকগুলি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। শিশুকে গোড়া থেকে এইভাবে শিক্ষা দিলে

ভ্রমপ্রমাদবিরল বিশুদ্ধ ভাষা লেখা তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। ইংবিজি বিদ্যালয়ে পড়া বাঙালী ছাত্রেরা কত অল্প বয়সে, কত সহজে, কেমন বিশুদ্ধ ইংরিজি লিখতে পাবে তাব থেকেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া কিছু আয়াসসাধ্য হলেও ভ্রম সংশোধন করবার সময়ে ভ্রমেব স্বল্পতা দেখে শিক্ষক নিশ্চয়ই একে ধন্যবাদ দেবেন।

লিখতে দেবার পূর্বে রচনার বিষয়বস্তুটি ক্লাসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে নেওয়া ভ্রমসংখ্যা কমাবার দ্বিতীয় উপায়। অনেক সময়ে ছাত্র তার বিষয়বস্তুটি গুছিয়ে লিখতে পারেনা বলে ভুল বেশী হয় কিন্তু নিপুণভাবে আলোচনা করা হলে শিক্ষক ও ছাত্রেব সম্মিলিত পরিশ্রমে বিষয়বস্তুটি এমন সুন্দবভাবে সজ্জিত হয়ে থাকবে যে ভুলের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির দোষ প্রদর্শন করে বলা যায় যে পরীক্ষার ভয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করবার তাড়ায় শিক্ষকদের এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে তাঁবা তত যত্নেব সঙ্গে শিক্ষা দিতে বা প্রশ্নের আলোচনা করতে পারেননা। কিন্তু শিশুদের ছোটবেলা থেকে স্বাধীন চিন্তায় ও আলোচনায় অভ্যস্ত করে রাখলে তাদের মৌলিকতা এমন উদ্বোধিত ও মার্জিত হয়ে ওঠে যে, যে-কোন প্রশ্নের ধারা তারা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে নিতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক সম্ভাব্য প্রশ্নের পৃথক আলোচনা না করে পাঠ্য বিষয়গুলির সাধারণভাবে এমন করে আলোচনা করা যায় যাতে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতেই অসুবিধা হয়না। সাপ্তাহিক পরীক্ষার সময়ে কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্য থেকে বেছে বেছে লিখতে দিলে সেগুলি

ভাল করে তৈরী করা থাকবে। কেবল একটু দৃষ্টি রাখতে হবে যে ছাত্রেরা উত্তরগুলি মুখস্থ করে না আসে।

ভ্রম এড়াবার পদ্ধতি যত সাবধানতার সঙ্গেই অবলম্বন করা হয়ে থাকুকনা কেন, লিখবার সময়ে দু'চারটা ভুল নিশ্চয় ঘটবে। সেগুলি কেবল কালী দিয়ে কেটে না দিয়ে, কি ধরণের ভুল হয়েছে সেটা পাশে লিখে দিলে এবং খাতা ফেরৎ দেবার সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের ভ্রমগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করে দিলে ভাল। যদি ক্লাসের ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের জন্য পৃথকভাবে সকলের খাতা নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব হয় তবে তখন সাধারণ ভুলগুলির উল্লেখ করে দিয়ে, যাদের বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন তাদের আলাদা ডেকে নিয়ে কথা বলা উচিত। তারপরে ছাত্রদের দিয়ে কাগজে কলমে সেই ভ্রমগুলির সংশোধন করা চাই।

অনেক সময়ে কোন কোন ছাত্র এত বেশী ভুল করে যে তার সব রকমের সকল ভুল একসঙ্গে দেখিয়ে দিলে তার পক্ষে তা মনে রাখা সম্ভব নয়। তার খাতার সব ভুল সযত্নে সংশোধিত করলেও উপকার হবেনা বলেই এক এক করে ভুলগুলির সংশোধন করতে হয়। যেটি তার সবচেয়ে মারাত্মক দোষ সেটি দিয়ে আরম্ভ করে একটি করে সংশোধিত হলে আরেকটি নিয়ে আস্তে আস্তে ভাষার বিশুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয়।

ছাত্রদের ভ্রম যত কমই ঘটুকনা কেন খাতার সংখ্যা অতিরিক্ত বেশী হলে শিক্ষকের পক্ষে সেগুলি যথাযথভাবে সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই শুধু নিজের দিকে নয়, ছাত্রদের দিকে চেয়েও খাতার সংখ্যা কম করতে হবে। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে এমন ঘন ঘন লেখার দিন নির্দিষ্ট

করা থাকে যাতে সত্যসত্যই খাতাগুলি ভাল করে সংশোধন করা সম্ভব হয়না। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র ক্লাসের ছেলেদের উৎকর্ষের তারতম্যানুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করে নিয়ে একেক দিন একেক দলকে দিয়ে লেখালে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হবে। ছাত্রদের যদি দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় তবে যেদিন এক দলের লিখবার পালা সেদিনটি অপর দলের ভ্রম সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট করা যায়।

উপরের ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্রকে দিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর না লিখিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি করে ছাত্রকে দিয়ে একেকটি প্রশ্ন লিখিয়ে সমস্ত শ্রেণীর দ্বারা তার আলোচনা করালে সকলেরই প্রত্যেকটি প্রশ্ন শেখা হয়ে থাকে। এতে একেকটি প্রশ্ন তৈরী করার ভার ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের উপর থাকে বলে কম পরিশ্রমে কাজ অধিক অগ্রসর হয়।

ক্লাসকে কোনরকমভাবে ভাগ করে নেওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে মাঝে মাঝে এক এক দিন এমন প্রশ্ন দিতে হবে যার উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত হয়। তাতে খাতা দেখার পরিশ্রম লঘু হবে ও ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা নূতন দিক মার্জিত হবে। এমেরিকায় এই ধরণের পরীক্ষার নিয়ম (fool-proof examinations) কোন কোন ক্ষেত্রে খুব কার্যকর হয়েছে। ব্যাকরণের উপরও এমন প্রশ্ন দেওয়া যায় যার উত্তর দিতে ছাত্রেরা খুব উৎসাহ বোধ করবে এবং সংশোধনেও বেশী পরিশ্রম নাই। তাছাড়া কোন কোন প্রশ্নের উত্তর এমন ধরণের হয়, যেটা লিখে ছাত্রেরা নিজেরা খাতা বদল করে ভ্রমসংশোধন করতে পারে।

ক্লাসের আর বাড়ীর কাজের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। ক্লাসে বসে কাজ করবার বিরুদ্ধে

অনেকে বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের তাড়াহুড়োর মধ্যে রচনা কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারেনা; কিন্তু এক ঘণ্টায় প্রশ্নের আলোচনা করে, অপর একটি ঘণ্টায় তার উত্তর লেখান হলে এই দোষের অনেকটা ক্ষালন হয়। তাছাড়া বাড়ীতে বসে প্রচুর সময় নিয়ে লিখতে অভ্যস্ত থাকলে ছাত্রদের শুধু যে পরীক্ষার সময়েই বিপদে পড়তে হয় তা নয়, জীবনে অনেক তাড়াতাড়ির কাজেও অসুবিধা বোধ করতে হয়।

বাড়ীর কাজের জন্য ছাত্রকে অনেকটা বিশ্বাস করতে হয়। বাড়ীতে যে কাজটা করা হয়েছে সেটা তার স্বচেষ্টাকৃত কি না সে বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাত্রের নিজের উপরই ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া, বাড়ীর কাজের জন্য যদি কোন সময় নির্দেশ করা হয়ে থাকে তাহলে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে ছাত্রের মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ থাকেনা। এইজন্য একটু দায়িত্বজ্ঞান হবার মত বয়সের আগে বাড়ীর কাজ না দেওয়াই ভাল। নীচু ক্লাসে বাড়ীর কাজ দেওয়ার অবাঞ্ছনীয়তার আর একটি কারণ এই যে, সারাদিন বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকার পরও বাড়ীর জন্য কাজ নিয়ে গেলে সেটা ছোট শিশুর পক্ষে অতিরিক্ত হতে পারে।

মোটকথা, বাড়ীর ও ক্লাসের কাজ উভয়েরই যখন উৎকর্ষাপকর্ষ দুই রয়েছে তখন সমানভাবে দুই মিলিয়ে করানই ভাল, খালি নীচের ক্লাসে বাড়ীর কাজ দেওয়া অবাঞ্ছনীয়।

কোন্ কোন্ কাজ ক্লাসে আর কোন্ কোন্ কাজ বাড়ীতে করার বেশী উপযোগী তা মোটামুটিভাবে নির্দেশ করা যায়। ছাত্রদের বিদ্যালয়ে দৈনিক পড়া বাড়ীতে বসে করতে হয়, পরীক্ষার পড়া বাড়ীতে শিখতে হয়। তাছাড়া যেগুলি সময়

সাপেক্ষ, অথবা নির্জনে বসে ভেবেচিন্তে করতে হয় এমন কাজ বাড়ীতে করার খুব উপযোগী, যেমন হাতের লেখা, অনুলেখন, স্বয়ংসঞ্চয়ন, কবিতা বা গল্প জাতীয় কোন মৌলিক রচনা, ইত্যাদি। অন্যান্য ধরণের লেখার অভ্যাসও বাড়ীতে করতে দেওয়া যায়, তবে ক্লাসেই বেশীর ভাগ করা ভাল কেননা তাতে অবস্থার সামান্যের জন্য রচনার আদর্শও অনেকটা সমান হওয়ার সম্ভাবনা। অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষে যেমন অভ্যাস বজায় রাখবার জন্য বাড়ীর কাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বাংলায় তেমন নয় বলে বাড়ীর কাজের পরিমাণও কম হতে পারে।

খাতার সংশোধন লাল কালীতেই করা উচিত, কেননা কালো লেখার মধ্যে লাল অতি সহজে চোখে পড়ে। ছাত্রদের কালো কিংবা ব্লুব্ল্যাক ভিন্ন অন্য কোন রঙের কালী ব্যবহার করা ভদ্রতাসঙ্গত বলে মনে করা হয়না। ছাত্রের কাছ থেকে শিক্ষক যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ আদায় করবেন, তেমনি শিক্ষকের সংশোধনও পরিষ্কার হওয়া চাই।

সংশোধন সহানুভূতির সঙ্গে করতে হবে, কেননা শিক্ষকের রাগের ভয়ে ছাত্রদের উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়, তার মনে এমন উত্তেজনা জন্মায় যাতে ভুলের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে; তাছাড়া পড়াশুনার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

পক্ষপাতশূন্যতা শিক্ষকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। পক্ষপাত সব সময়ে স্বেচ্ছাকৃত হয়না। শিক্ষকের খাতা দেখবার সময়কার মনের ভাবের অনুযায়ী নম্বরের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়, তাই শিক্ষকের এক এক দলের খাতা যতদূর সম্ভব একই সময়ে দেখা উচিত। মন বা শরীর খারাপ থাকলে, সেই সময়ে

অবিচার ঘটার সম্ভাবনা বলে, যতদূর সম্ভব সেরূপ সময়ে খাতা না দেখাই ভাল। অনেক সময়ে কোন মেধাবী ছাত্রের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত শিক্ষকের নিজেরও অজ্ঞাতসারে পক্ষপাত ঘটে। এইজন্য শিক্ষককে খুব সাবধান থাকতে হবে, এবং যতদূর সম্ভব খাতাগুলির তুলনা করে মনে একটি আদর্শ স্থাপিত করে তাঁর সেই অনুযায়ী নম্বর দেবার চেষ্টা করা উচিত।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ভাষার মেরুদণ্ড হলেও ভাষাশিক্ষার ভিত্তি হতে পারেনা। কিন্তু ভাষাজ্ঞানের জন্য ও রচনার বিশুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা প্রয়োজনীয়। সকল শিল্পেরই মূলীভূত বিজ্ঞান থাকে এবং সেই বিজ্ঞানের নির্ভুল জ্ঞানের উপর সেই শিল্পের পূর্ণ পরিণতি নির্ভর করে। ব্যাকরণ সাহিত্যকলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ সুন্দর সাহিত্যালোচনার পরিপোষক।

ভাষার উদ্ভবের সময়ে মানুষ সচেতনভাবে নিয়ম তৈরী করে কথা বলতে আরম্ভ করেনি। যে বিশেষত্বগুলি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ভাষায় এসেছে, পরে মানুষ সেগুলিকে লক্ষ্য করেই সূত্র গেঁথেছে। শিশুকে শিক্ষা দেবার সময়েও ভাষা ও ব্যাকরণের এই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে ব্যাকরণের পাঠ সুরু হয়না। সাধারণত তৃতীয় শ্রেণী থেকে ব্যাকরণ পড়ান হয়ে থাকে এবং চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণী থেকে পৃথক ব্যাকরণের ঘণ্টার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে শিশুর এই পরিচয় ধীরে ধীরে হওয়া চাই। প্রথম যখন সে ব্যাকরণ শিখবে তখন কেবল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শব্দগুলির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু শ্রেণীবিভাগের জ্ঞান যেন শিক্ষকের উপদেশ থেকে না পেয়ে শিশু নিজ অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পারে; অর্থাৎ সহজ বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুকে ব্যাকরণ শেখাতে হবে।

নিয়ম ও সূত্র শিখবার আগে তার মূলীভূত সত্যটিকে শিশুকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। শিশু নিজেই লক্ষ্য করতে পারবে যে শব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলি 'নাম' বোঝায়, কতকগুলি 'কাজ' বোঝায়, কতকগুলি 'গুণ' বর্ণনা করে, কতক-গুলি শব্দ অন্য শব্দের 'বদলে' বসে, কতকগুলি অন্য দুই শব্দের মধ্যে 'যোগ' স্থাপন করে, ইত্যাদি। এর জন্য চার্ট তৈরী করা যায়, কিন্তু এখনই তাদের নাম শিখবার দরকার নেই। একটি কাগজে বড় বড় অক্ষরে কতকগুলি বাক্য লেখা রইল, তার মধ্যে বিশেষ্যবিশেষণাদি যে শ্রেণীর শব্দের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাওয়া হচ্ছে সেইগুলি কোন বিশেষ রঙে লিখতে হবে। এমনি করে একেক শ্রেণীর শব্দের জন্য একেকটি পৃথক চার্ট তৈরী করা যায়। বোর্ডে লিখে শিক্ষা দেবার সময়েও বিশেষ শব্দগুলি রঙিন খড়ি দিয়ে লেখা যায়।

ক্রমে শিশু বাক্যের গঠনের সঙ্গে পরিচিত হবে। সে নিজেই বুঝতে পারবে যে শব্দের বিশেষ সমষ্টিতে অর্থবোধ হয়, এবং সেই বিশেষ সমষ্টিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বাক্য থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। একই বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করে দেখালে এ সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান উজ্জ্বল হবে। তারপর শিশু বাক্য-রচনার ও সন্নিবেশের নানা বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে পারবে; এই জ্ঞানের জন্য প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। বাক্যগুলি ভেঙে ভেঙে শিশুকে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি দেখান যেতে পারে। যেমন "রাম যদুকে মেরেছে" এই বাক্যটি অবলম্বন করে "এখানে কি কাজ হচ্ছে?"—"কাজটা কে করছে?"—"কাকে নিয়ে করছে?"

ইত্যাদি প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও এর বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাকরণগত নাম বলবার দরকার নেই।

ভাষার কার্যকরী ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করবার পর প্রকৃত ব্যাকরণ-শিক্ষার সময় আসবে, তখন সূত্রনিয়মাদি আয়ত্ত করা সহজ হবে কিন্তু এ সময়েই যাতে ছাত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূত কোন শিক্ষা না দেওয়া হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। সূত্রনিয়মের জ্ঞানকে পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, উদাহরণের পর উদাহরণ শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে, বাক্যের পর বাক্য ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে, এলোমেলো উল্টোপাল্টা বাক্যকে সোজা করে সাজাবার অভ্যাস করাতে হবে। এ সমস্তই তার পূর্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, খালি নাম ও সংজ্ঞাগুলি নূতন। নামের অর্থগুলি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিলে নামগুলি মনে রাখতে শিশুর মুস্কিল হবে না, তাছাড়া নাম মনে রাখবার জন্য বেশী জোর করবার দরকারও নেই, সেটা আস্তে আস্তে অভ্যাসের দ্বারা হবে। সংজ্ঞাগুলি মোটামুটিভাবে শিশুদের নিজেদের গড়ে নিতে দিতে হবে, পরে শিক্ষক সেগুলিকে মার্জিত ও সংশোধিত করে দেবেন। যেমন বিশেষ্যের সংজ্ঞা শিশু নিজেই হয়ত বলে দিতে পারবে যে বিশেষ্য বস্তু, ব্যক্তি, ভাব ইত্যাদির নাম, পরে শিক্ষকের সাহায্যে মার্জিত হয়ে সেইটাই পূর্ণ সংজ্ঞায় পরিণত হবে। সংজ্ঞা-গঠনের ভ্রম হলে শিক্ষককে উদাহরণের সাহায্যে কারণ প্রদর্শন করে ভ্রম সংশোধন করতে হবে।

উঁচু ক্লাসেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শেখান হলে ছাত্র অনেকাংশে ব্যাকরণ-বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিত্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড ও উদাহরণের

সাহায্যে ছাত্রের নিজের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে ব্যাকরণ-শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। যে কোন বিষয়েই হোকনা কেন শিক্ষককে প্রচুর পরিমাণে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই উদাহরণ-সমূহের মধ্য থেকে ছাত্র স্বয়ং বিশেষ বিষয়টি আবিষ্কার করে নিতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিশিষ্ট বাক্যভঙ্গির কথা ধরা যেতে পারে। শিক্ষক যে কটি বিশিষ্ট বাক্য শিক্ষা দিতে চান তার প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করে কয়েকটি বিভিন্ন বাক্য রচনা করবেন। এর জন্য চার্টও তৈরী করা যেতে পারে; যদি প্রত্যেকটি বিশিষ্ট-ভঙ্গি অবলম্বন করে বিভিন্ন বাক্য রচনা করা যায় তবে শিক্ষক একেকটি ভঙ্গির উদাহরণ-সমন্বিত বিভিন্ন পাঁচটি বাক্য একেকটি 'চার্ট' পরিষ্কার করে লিখবেন, এর থেকে ছাত্র নিজেই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি বেছে নিতে এবং বাক্যগুলির অর্থ থেকে ভঙ্গিটির অর্থ বুঝতে পারবে। তারপর পুনরালোচনা এবং প্রয়োগের সময়ে যে চার্ট ব্যবহার করা হবে তাতে বাক্য-গুলির অন্য অংশগুলি কালো কালীতে লিখে বিশেষ অংশ লাল বা কোন রঙিন কালীতে লিখবেন। অর্থাৎ 'সোনায় সোহাগা' এই কথাটা অবলম্বন করে যদি একটি বড় কাগজে পাঁচটি বাক্য রচনা করা যায় তবে সেই বাক্যগুলির অন্যান্য অংশ কালো কালীতে এবং 'সোনায় সোহাগা' এই অংশটি লাল কালীতে লিখতে হবে তাতে বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি ছাত্রদের মনে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে যাবে।

আজকাল অলঙ্কার বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে। অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করা যায়। অলঙ্কার পাঠ্যবিষয় থাকলে শিক্ষককে প্রথমত অলঙ্কারকে

কেন অলঙ্কার বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে তা ছাত্রদের বোঝাতে হবে। এর জন্য একই কথা একবার সোজাসুজি ও একবার অলঙ্কারপূর্ণভাবে লিখে পাশাপাশি রেখে দেখাতে হবে। এইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে একটি চার্ট তৈরী করে দিলে তার মধ্যে থেকে ছাত্র নিজেই অলঙ্কারের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারবে। তারপর শব্দ ও অর্থালঙ্কারের বিভেদও দুই প্রকারের অলঙ্কার পাশাপাশি রেখে দেখালে সে নিজেই বুঝে নিতে পারবে। প্রতিটি অলঙ্কার বিশেষ করে শেখাবার সময়ে সেই অলঙ্কারটির বহু উদাহরণ পরপর দেখালে ছাত্র তার বিশেষত্ব নিজেই বুঝতে পারবে। এইরূপে ছাত্রদের নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শিক্ষকের সাহায্যে সংশোধিত ও মার্জিত হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

এই পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষককে কষ্ট করে বহু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে ছাত্রের নিজের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা ও সাহায্য করতে হবে; এতে সময় বেশী লাগবে, কিন্তু শিক্ষা এত গভীর ও নির্ভুল হবে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হবে।

ব্যাকরণের শিক্ষা দেবার সময়ে বাংলার প্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। একেবারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বাংলা শেখান যেতে পারেনা একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। সমাস, প্রত্যয়, বিভক্তি, বিশিষ্ট ভঙ্গি, অলঙ্কার যাই শেখান হোকনা কেন, কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও উদাহরণমালা দিলে চলবেনা, খাঁটি বাংলার প্রাকৃত শব্দ থেকেও উদাহরণ দিতে হবে। সম্প্রতি কতকগুলি ব্যাকরণের পুস্তকে এ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, এটা সুখের

কথা, কিন্তু আরো বেশী দৃষ্টি এদিকে পড়া উচিত এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ রচিত হওয়া উচিত।

অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মত ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তকও যে কণ্ঠস্থ করবার একমাত্র অবলম্বন নয় একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। ছাত্রদের পাঠের জন্য কোন বই নির্দিষ্ট করে না দিয়ে শিক্ষকের সংগৃহীত জ্ঞান ও নিজেদের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে নোট তৈরী করতে উৎসাহিত করা উচিত। শিক্ষককে অবশ্য নিজের সুবিধার জন্য বই রাখতে হবে; তবে তাঁর একটি বইয়ের উপর নির্ভর না করে একাধিক বই অবলম্বনে পড়ানো উচিত।

সম্প্রতি শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাকরণের ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া উচ্চতর ব্যাকরণ পড়ান উচিত কি না। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী এবং সমাধান বহু আলোচনা ও সময়সাপেক্ষ। যতদিন শিক্ষা-বিভাগ-কর্তৃক এর কোন একটি মীমাংসা না হয় ততদিন ব্যাকরণ পড়াতেই হবে, কাজেই ততদিন ব্যাকরণ শেখানোর পদ্ধতির আলোচনার প্রয়োজনও থাকবে।

ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য

ব্যাকরণ ভাষার বিশুদ্ধতার ভিত্তি হলেও রচনার মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ সাহিত্যরীতিবিরোধী। ব্যাকরণের কাজ "অদ্রি হলে শিলা"র মত ভাষার অন্তরালে থেকে ভাষাকে বিশুদ্ধ করে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলা। ব্যাকরণ ভাষার বিশুদ্ধির সহায়ক, আবার বিশুদ্ধ ভাষা সুসাহিত্যের পরিপোষক; এই তিনটি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত অংশের শিক্ষার ক্রম উপস্থিত পরিচ্ছেদে আলোচ্য।

শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন ভাষার বিশুদ্ধ ব্যবহার শিক্ষাই তার বাংলা ক্লাসের একমাত্র শিক্ষা। তার তখনকার ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণের সূত্রের উপর স্থাপিত নয়, ভাষার ব্যবহারিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত; কাজেই সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ের এই স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষার স্থান নেই, এবং বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর পূর্বে ব্যাকরণের ক্লাসের ব্যবস্থাও থাকেনা। অপর পক্ষে, সচেতনভাবে ব্যাকরণ শিখবার আগে থেকেই শিশু ব্যাকরণের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকে (ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); কাজেই সেদিক থেকে বলা যায় যে বিদ্যালয়ের বেশ নীচের দিক থেকেই শিশুর ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হয়।

সাহিত্যের বিষয়েও ওই একই কথা প্রযোজ্য। শিশুর ভাষাবোধের প্রথমাবস্থায় সাহিত্যবোধ হয়নি বলে মনে করা ভুল, কেননা ভাষার সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হলেও তার সৌন্দর্য শিশুর দৃষ্টি এড়ায়না। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে বলেছেন যে

তিনি অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত কাব্যের অর্থ না বুঝেও শুন’ত এবং পড়তে ভালবাসতেন, এবং উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্র তাঁকে এমনই অভিভূত করেছিল যে দু’চোখ ভরে তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন। সাহিত্যবোধ শিশুমনে অন্তর্নিহিত থাকে এবং অল্পবয়সী শিশুর পক্ষে ছেলেভুলোনো ছড়া সাহিত্য হিসেবে উপযোগী। দুই তিন বৎসর বয়স থেকেই শিশু দু’চার ছত্র ছড়ার আবৃত্তি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে আছে, যেদিন তিনি প্রথম পড়লেন “জল পড়ে, পাতা নড়ে,” সেদিন এই দুটি সমিল ছত্রের কাব্য সারাদিন ধরে তাঁর মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। তৎরচিত “সহজপাঠে” এই জন্যই বোধ হয় পদ্যের এত ছড়াছড়ি।

ইংরেজের Nursery Rhymes প্রসিদ্ধ ও বহু আদৃত শিশুসাহিত্য। আমাদের দেশে ছেলেভুলোনো ছড়ার অভাব নেই, কিন্তু আমরা তার মূল্য বুঝিনা বলে তেমন আদর করিনা, এইজন্য বিলিতি ইস্কুলের ছেলেরা যে নাচগান ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যপরিচয় লাভ করে আমাদের ছেলেরা তার থেকে বঞ্চিত থাকে। আজকাল অনেক বিদ্যালয়ে বাংলার ঘণ্টার পাশাপাশি আবৃত্তির ঘণ্টা চিহ্নিত করে দিয়ে একটা আপোষের প্রচেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু পুরোপূরিভাবে আনন্দ ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে বাংলা শেখাবার সাহস এখনও বহুদূরে।

প্রচলিত বাংলাশিক্ষার প্রকৃতি অনুসারে এই কথা বলা যেতে পারে যে বিদ্যালয়গুলিতে যদিও ব্যাকরণের আলাদা ব্যবস্থা চতুর্থ শ্রেণীর আগে হয়না এবং বিশেষ করে সাহিত্যের আলোচনার ক্লাস যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, অষ্টম অথবা

নবম শ্রেণীর আগে নয়, তবু বাংলাশিক্ষার প্রথম পাঠের মধ্যে একই সঙ্গে, একই ঘণ্টায় ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের পাঠ মিলিত হওয়া উচিত, এবং এমন করে মেলা উচিত যাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যকে উপভোগ করতে করতে শিশুর নিজেরই অজ্ঞাতসারে তার ভাষা ও ব্যাকরণের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিলিতি ধরণে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে এই পদ্ধতির আশ্চর্য সাফল্য দেখা যায়। আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'কনভেণ্টে' পড়া কৃতী ছাত্রী একবার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে-ছিলেন—"ব্যাকরণ আবার আলাদা করে শিখতে হয় নাকি ?" সত্যিই তো, ব্যাকরণ একটা বস্তুসম্পর্কহীন হাওয়ার ব্যাপার নয়, সাহিত্যশিল্পেরই বিজ্ঞান, তবে সেই শিল্প থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে তার সকল আলোচনা কি করে সম্ভব হবে ?

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে ব্যাকরণ শিক্ষার সূত্রপাত হয় এবং ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রের ব্যাকরণ জ্ঞান এতটা অগ্রসর হয়েছে বলে ধরা যায় যে বৈজ্ঞানিকভাবে তার আলোচনা তার পক্ষে সহজ হয়। ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতির আলোচনা পূর্বেই হয়েছে, এখন কেবল বলে রাখা দরকার যে যদিও ব্যাকরণের জন্য পৃথক ঘণ্টার প্রয়োজন আছে এবং পৃথক ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েও থাকে তবু ব্যাকরণকে ভাষা থেকে একটি আলাদা জিনিষ বলে শিশুর যেন ধারণা না হয়। বিদ্যালয়ে যেমন প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক একটা ঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও সবগুলিকে এক করে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াসকেই আদর্শ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে (correlation of subjects), ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরস্পরের সম্বন্ধবিষয়ে সে কথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও ব্যাকরণের

ক্লাসে ব্যাকরণ, রচনার ক্লাসে রচনা ও পাঠ্যপুস্তকের ক্লাসে পাঠ্য পড়ান হয়ে থাকে তবু শিক্ষককে এদের পরস্পরের সংযোগসূত্রটির প্রতি সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ব্যাকরণ ও রচনার ঘণ্টায় ক্রমাগত পাঠ্যাংশ থেকে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে এদের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া চাই; আবার সাহিত্যের ঘণ্টায় অধীত বিষয়ের ব্যাকরণের আলোচনা-দ্বারা সাহিত্যের মেরুদণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ রুটিনে আলাদা করে চিহ্নিত করা থাকলেও এগুলিকে আলাদা বিষয় বলেঁ মনে করা উচিত নয়।

অনেক বিদ্যালয়ের উচ্চতম দুটি বা তিনটি শ্রেণীতে সাহিত্যের জন্য বিশেষ ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা থাকে। উপরের ক্লাসে ব্যাকরণ ও ভাষার জ্ঞান অনেকটা আয়ত্ত হয়েছে বলে মনে করা যায়; তাই সাহিত্যের জন্য চিহ্নিত ঘণ্টায় ব্যাকরণ বা ভাষার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপ আলোচনার ততটা দরকার হয়না।

সাহিত্যের ঘণ্টায় সাধারণত তাড়াতাড়ি পড়বার জন্য (Rapid Reading) নির্দিষ্ট বইগুলি পড়ান হয়ে থাকে। পরীক্ষার পাঠ্যের মত এই বইগুলিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়না। বইয়ের বিষয়বস্তুটি বালকেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করা হয়, প্রত্যেকটি শব্দার্থ বুঝতে হবে এমন কোন নিয়ম নাই। বইয়ের সাহিত্যিক উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনাও কিছুটা হওয়া চাই এবং তার সঙ্গে ভাষার সাধারণ বিশেষত্বগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার চেয়ে বেশী ব্যাকরণ ইত্যাদির আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

সাহিত্যালোচনা সম্বন্ধে ইংরিজিতে criticism ও appreciation বলে যে দুটি শব্দ প্রচলিত আছে তার প্রথমটিকে

যদি সমালোচনা বলি তবে দ্বিতীয়টিকে অনুভব বল্লে ভুল হবে না। বিদ্যালয়ের ছাত্রের সাহিত্যালোচনার মধ্যে সমালোচনা অপেক্ষা অনুভবের প্রাধান্য, কেননা বালক তার পঠিত সাহিত্যকে যখন মনে মনে যাচিয়ে নিতে চায় তখন তার অপরিপক্ক সমালোচনাজ্ঞান ও সাহিত্যবুদ্ধি নিয়ে সত্যকারের মহৎ সাহিত্যের সমালোচনা করা তার পক্ষে কঠিন হলেও তার মহত্ত্বানুভব সহজ।

অনুভব মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তির সাহায্যেই আদি আর্য ভগবানকে জলে, স্থলে, অগ্নিতে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতে দেখেছিল। এর মধ্যে যুক্তি, তর্ক, বিচার ইত্যাদির চেয়ে অনুভূতির বোধটাই উচ্চতর স্থান লাভ করেছে।

সাহিত্যের অর্থ বুঝবার আগে এই অনুভূতিই শিশুকে সাহিত্যের প্রভাবের বশবর্তী করে ফেলে। এইজন্যই ছেলে-ভুলোনো ছড়া বড়দের কাছে অসংবদ্ধ বলে প্রতীয়মান হলেও শিশু তাকে পরম বিস্ময়কর বলে অনুভব করে। এইরূপে নিম্নতম ধাপ থেকে সাহিত্যানুভবে অভ্যস্ত হতে হতে তাকে বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতির পাদপীঠতলে উপনীত হতে হবে।

নিম্নতম শ্রেণীর শিশুর সাহিত্যানুভব জাগ্রত করাই শিক্ষকের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই জিনিষ যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করা যায়না, প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালার মত হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষকের সাহিত্যানুরাগ গভীর এবং প্রবল না হলে কেমন করে ছাত্রের উপর তার প্রভাব পড়বে? এইরূপ সঞ্চার সব ক্ষেত্রেই কঠিন, কিন্তু শিশুসাহিত বিষয়ে

কঠিনতম; কেননা, এমন মানুষ খুব অল্পই দেখা যায় যিনি পূর্ণবয়সের পরিপক্কতাকে অতিক্রম করে শিশুসাহিত্যের রাজ্যে শিশুর সমান অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারেন।

উপরের ক্লাসে সাহিত্যানুভবের জন্য বিশেষ পাঠপদ্ধতি (appreciation lesson) অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণাদির সূক্ষ্ম আলোচনা থাকেনা। দ্রুতপাঠের পুস্তক, পাঠ্যবহির্ভূত কোন সাহিত্যাংশ এবং পাঠ্যপুস্তকেরও রসপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য অংশ নিয়ে এরূপ ক্লাস নেওয়া যায়। এতে শিক্ষককে ছাত্রের সমান আসনে নেমে আসতে হবে, কেননা পরিপূর্ণ সহানুভূতি বিনা অনুভবের ভাবসঞ্চার অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভবের জন্য অর্থবোধের প্রয়োজন প্রধান নয়, কেন-না—"জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তা সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা।" প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝে পাঠ করাকে তিনি "শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ" খতানর মত বলেছেন এবং "সংসারের পাড়ায় হাটবাজার"এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনুভবকে তিনি সমুদ্রের তীরে বা পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে মানবমনে যে অপার মহিমাবোধ হয় তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পরিচয় সাহিত্যানুভবের অপর অঙ্গ। নদীর ধারার মত বহমান সাহিত্যের ধারার পরিচয় পেলে তবে মানবহৃদয়ের সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগসাধন সহজ হয়। ইংরিজিতে বিদ্যালয়ের বালকদের সাহিত্যপরিচয়ের জন্য অতি সহজ ও সরস গল্পের আকারে লেখা সাহিত্যের ইতিহাসের বই পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের ছেলেদের এরূপ পরিচয়

করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনা, তাই এমন বই আমাদের ভাষায় দেখতেও পাওয়া যায়না।

সাহিত্যানুভব বাড়াবার জন্য শিক্ষক ছেলেদের পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বই পড়তে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদের জন্য পুস্তকাগার থাকে, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে তার বাংলা অংশ অতি ক্ষুদ্র; বাংলার শিক্ষককেই সচেষ্ট হয়ে এই অভাব দূর করতে হবে।

অনেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর আলাদা পুস্তকসংগ্রহ থাকে। এইটাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং আধুনিক মতসম্মত। প্রতি শ্রেণীব পুস্তকসংগ্রহ আলাদা করা থাকলে সাধারণত তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছাত্রদের উপরই ন্যস্ত থাকে, তাতে তাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়; এবং নিজেদেব শ্রেণীর পুস্তক-সংগ্রহের আপেক্ষিক উৎকর্ষবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রেরই সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যানুশীলন বর্ধিত হয়। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বই তত্তৎ শ্রেণীব বালকেরা হাতের কাছে পায় বলে বেছে নেবার সুবিধা হয় এবং নিম্নতর শ্রেণীর বালকেরা "বড়দের বই" পড়বার জন্য প্রলুব্ধ হয় না।

ছাত্রদের উৎসাহ বাড়াবার জন্য শিক্ষককে বিদ্যালয়ের এবং শ্রেণীসমূহের পুস্তকাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখতে হবে। ছাত্রদের পাঠের ক্রম নির্দেশ করে, উৎকৃষ্ট বইয়ের সন্ধান দিয়ে এবং অধীত বইয়ের আলোচনা করে তাদের সাহিত্যানুরাগ বর্ধিত ও সাহিত্যালোচনা সফল করে তুলতে হবে। ছাত্রদের দ্বারা নূতন বইয়ের সমালোচনা লিখিয়ে পাঠ করালে বা বিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশ করালে তাদের উৎসাহ অধিক হয়। এইজন্য শিক্ষককে ছোটদের উপযোগী আধুনিকতম

সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত থেকে ক্রমাগত লাইব্রেরীর সংগ্রহ বাড়াতে হবে। কেবল কবিতা বা গল্পের বই না কিনে প্রবন্ধ, ভ্রমণ, জীবনী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকও সংগ্রহ করতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার আসনের স্থাপয়িতা স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তির উপর জাতীয় চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এবং নির্দেশ করেছিলেন যে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের গঠন সম্ভব নয়। আমাদের বালকদের অল্প বয়স থেকেই সেই পূর্ণাবয়ব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার বাংলার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত।

ছোটদের সাহিত্য

বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয়ে থাকে সেগুলি শিশুসাহিত্যেব বহির্ভূত। বিদ্যালয়ের পাঠনের পদ্ধতিও সাহিত্যালোচনার বিরোধী। আমাদের পাঠ এত সীমাবদ্ধ ও পদ্ধতি এত প্রাচীন যে তার দ্বারা ছাত্রদের বিস্তীর্ণ সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে উপনীত করা প্রায় অসম্ভব।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যহিসাবে যে সকল 'চয়ন' ও 'সংগ্রহ' জাতীয় পুস্তক পড়ান হয়ে থাকে তার অন্তর্গত কবিতাগুলিতে সুসাহিত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও গদ্যাংশের প্রকৃতিতে সাহিত্যের চিহ্ন নেই বল্লেই হয়। যে সমস্ত গদ্য প্রবন্ধ তাতে স্থান পায় তাব মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় বহু থাকলেও সাহিত্যোপভোগের আনন্দের আশা সুদূরপরাহত।

সাধারণভাবে ছোটদের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার একটি দোষ দেখা যায়। অনেক লেখকই শিশুকে বয়স্ক মানবের অপরিণত সংস্করণ বলে ধরে নিয়ে অতি নিম্নশ্রেণীর গল্প তাদের যোগ্য মনে করে তাদের জন্য রচনা করেন। এইজন্য অনেক সময়েই দেখা যায় যে বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা লোমহর্ষক কাহিনীগুলির খেলো, সুলভ সংস্করণের বন্যায় ছোটদের সাহিত্য প্লাবিত হচ্ছে।

উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যকে শিশুমনের পূর্ণতা ও ভাববৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে তার অনুগামী হতে হবে। শিশু অপরিণত মানব নয়, সে পূর্ণপরিণত শিশুই। শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের মধ্যে দিয়ে সে যৌবনের দ্বারে উপনীত হবে, তার জীবনের

প্রতিটি স্তরেই সে নিজ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-দ্বারা সমৃদ্ধ। শিক্ষা দেবার সময়ে যেমন ছাত্রের জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সেই স্তরানুযায়ী বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে নিতে হয়, তেমনি শিশুসাহিত্যেরও শিশু, বালক ও কিশোরের মানসিক প্রয়োজনানুযায়ী তিনটি স্তর থাকার দরকার। আমাদের শিশুসাহিত্যে সেই বিভাগ নেই বল্লেই হয়; শিশু ও বালসাহিত্য আংশিকভাবে বর্তমান থাকলেও কিশোরসাহিত্যের অভাব স্পষ্ট।

সাহিত্য বলতে আমরা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য বুঝতে পারি, ছোটদের সাহিত্যেরও সেই পূর্ণতা আশা করি, তাই তাকেও সমস্ত শাখাপ্রশাখায় পূর্ণাবয়ব দেখতে চাই। গদ্য ও পদ্য এই সাহিত্যেরও প্রাথমিক দু'টি শাখা। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে পদ্যের কথা বলে পরে গদ্যের কথা বলব।

ছেলেভুলোনো ছড়াই শিশুর প্রথম কাব্য। বিলিতি Nursery Rhymesএর যেরকম রঙিন, সুন্দর সংস্করণ পাওয়া যায়, আমাদের গরীব দেশের ভাষার ছড়ার সেরূপ কোন সংস্করণ বোধ হয় সম্ভব নয়; এবং এক "খুকুমণির ছড়া" ও অপর রবীন্দ্রনাথের "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেভুলান ছড়া' নামক প্রবন্ধ ভিন্ন বাংলাভাষায় শিশুদের উপযোগী প্রাচীন ছড়ার কোনরূপ কোন সংগ্রহ আছে কি না জানিনা। ছোটদের আধুনিক কবিতা অপেক্ষা ছড়াগুলির উপযোগিতা এই যে, এগুলির মধ্যে শিশুমনের প্রকৃত রূপটি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়।

আধুনিক কোন কোন কবির রচিত ছড়াজাতীয় ও অভিনয়াত্মক বাংলা কবিতার বই শিশুর উপযোগী হয়েছে।

তার মধ্যে "ভজার বাঁশী", "ছন্দের টুংটাং" ইত্যাদির নাম করা যায়। ছোটদের কোন কোন বর্ণপরিচয় পুস্তকেও এত সুন্দর সুন্দর ছবি ও ছড়া সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে মনে হয় শিশুর কাছে বর্ণপরিচয় অপেক্ষা সাহিত্য হিসাবেই তার উপযোগিতা অধিক। এই সম্পর্কে "হাসিখুসী", "পড়াশুনা", "সহজপাঠ" প্রভৃতির নাম করা যায়। তাছাড়া রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত "ছোট্ট রামায়ণ" শিশুর নিজের রামায়ণ হয়েছে, আর "ভাতের জন্মকথা" বিষয়গৌরবে শিশুকে বালসাহিত্যেব দ্বারে উপনীত করে দেয়।

ইংরিজিতে ছেলেদের আবৃত্তি করবার উপযোগী কবিতাসংগ্রহ অনেক দেখা যায়; বাংলায় সম্ভবত "খেলার গান ও কবিতা" ভিন্ন এই শ্রেণীব বই পাওয়া যায় না; এবং উপরিউক্ত গ্রন্থেরও দোষ এই যে কবিতার সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচার করে সংগ্রহ করা হয়নি।

বালকদের উপযোগী কবিতার বইয়ের মধ্যে "আবোল-তাবোল" জাতীয় হাসির কবিতার বই দু'একটি ভিন্ন নাই। ইংরিজিতে "Hunting of the Snark" ও Lear এর কবিতাবলী বালসাহিত্যে যেরূপ সমাদর পেয়ে এসেছে আমাদের দেশের সেরূপ মনোভাব দেখা যায়না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথ" প্রকৃতপক্ষে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ না হলেও "শিশু"তে অনেকগুলি এবং "শিশু ভোলানাথে" কয়েকটি ছোটদের উপযোগী কবিতা আছে। এর কোন কোনটির মধ্যে শিশুমনের রূপটি অবিকৃত-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং কয়েকটির মধ্যে শিশুর ছেলেখেলার কথা এমন সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যা বালকদের

উপভোগ্য। বালক ও কিশোরবয়স্কদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র কবিতাগুলি উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের অনেক দেশাত্মবোধপূর্ণ কবিতা ও গান পড়ে এবং আবৃত্তি করে তারা আনন্দ পাবে। বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক অনেক কবির কবিতাসংগ্রহ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযুক্ত হতে পারে। মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্যে"র অনেকাংশ উঁচুক্লাসে এবং "নীতিগর্ভ কবিতাবলী" নীচের শ্রেণীতে পড়ান হয়ে থাকে, এতদ্ভিন্ন তাঁর চতুর্দশপদী ও সাধারণ গীতিকবিতার দু'একটিও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কাব্যকারের কবিতার অংশবিশেষ বহুদিন থেকেই কিশোরবয়স্ক বালকবালিকাদের পাঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বাগ্‌চি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জসীমউদ্‌দিন প্রভৃতি কারো কারো কবিতাকে কিশোর-সাহিত্য বলে উল্লেখ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে শিশু, বালক ও কিশোরদের উপযোগী বহু কবিতা থাকা সত্ত্বেও বোধ হয় একমাত্র "ছোটদের চয়নিকা" ভিন্ন আধুনিক কবিদের বালপাঠ্য কবিতার সংগ্রহ নাই; এবং প্রাচীন কবিদের দু'একটি কবিতা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও সাহিত্যহিসাবে ছোটদের জন্য সংগৃহীত হয়নি।

পদ্য অপেক্ষা গদ্য সাহিত্যই সাধারণ মানুষ বেশী পাঠ করে থাকে। তা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহনহিসাবে আধুনিক যুগে গদ্যেরই প্রচলন অধিক। সাধারণত গদ্য সাহিত্যের যে সকল শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে ছোটদের গদ্যেরও সেরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়।

বড়দের গদ্যের মধ্যে যেমন গল্প ও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা

সর্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি ছোটদের সাহিত্যের মধ্যেও ছোট ও বড় গল্পের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এই গল্পের মধ্যেও স্তর ও শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। আগেকার দিনে শিশুদের জন্য দক্ষিণারঞ্জনের "ঠাকুরমার ঝুলি" প্রভৃতি গ্রন্থ খুব সমাদৃত হত, কিন্তু আজকাল প্রাচীন ছড়ার মতই প্রাচীন গল্পগুলিও লুপ্তপ্রায়। একথা সত্য যে ওই গল্পগুলির লিখনরীতি হয়ত আধুনিক রুচিসম্মত নয়, কিন্তু শিশুমনের কাছে তার বিষয়বস্তুর মত সহজভাবে চিত্তাকর্ষক আর কিছু বোধ হয় হতে পারে না; বাংলার পল্লীকাহিনীর সংগ্রহের পুনঃপ্রচলন এই কারণেই বাঞ্ছনীয় এবং আধুনিক সংগ্রহের মধ্যে "টুনটুনীর বই" প্রভৃতির নাম করা যায়। অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুল" প্রাচীন পল্লীকাহিনীর রীতিতে রচিত গল্প। আজকাল সেগুলির পরিবর্তে ইংরিজি পরীকাহিনীর (Fairy Tales) অবলম্বনে রচিত কাহিনী ও অনুবাদ প্রচলিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে "গল্পের বই", "আরো গল্প" প্রভৃতি কতকগুলি বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছে।

বালকদের জন্য দেশবিদেশের নানা কাহিনী ভিন্ন নানাদেশের পুরাণ ও উপদেশের গল্পও ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, গ্রীক পুরাণের কাহিনী, ঈসপের গল্প ইত্যাদি। আমাদের দেশের হিতোপদেশ, জাতক, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির কাহিনীরও বালপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু বাংলা-ইংরিজি নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের এবং বিদেশেরও নানা গল্পের সংগ্রহ ছোটদের জন্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে হো, সাঁওতাল প্রভৃতি তথাকথিত অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলি একটি বিশেষ শ্রেণীহিসাবে গণ্য;

তাছাড়া "হিন্দুস্থানী উপকথা", "আরব্যোপন্যাস", ও নানা আরবী ও ফার্সী ছোটদের গল্পের বাংলা সংস্করণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটক ইত্যাদির কাহিনী বেশী প্রচলিত না থাকলেও দু'একটি দেখা যায়, তন্মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শকুন্তলা" স্বনামধন্য এবং একটু বড়দের জন্য "সংস্কৃত নাটকের গল্পে"র নাম করা যায়।

শিশুসাহিত্যের অপর একটি কল্পনাপ্রধান শাখা আছে, যার মধ্যে শিশুমনের অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "সে" এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা পাওয়া দুষ্কর। সুকুমার রায়চৌধুরীর "হযবরল", লীলা মজুমদারের "বদ্যিনাথের বড়ি" এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরিজি সাহিত্যের এই শ্রেণীর প্রসিদ্ধ কাহিনী "Peter Pan"এর ভাব অবলম্বনে রচিত অবনীন্দ্রনাথের "খাজাঞ্চির খাতা" লেখকের অপূর্ব কল্পনা-সম্ভারের দ্বারা শিশুর চিত্তাকর্ষণ করবে। শান্তা ও সীতা দেবীর "পঞ্চুলাল", "আজব দেশ" ও "হুক্কাহুয়া" ইংরিজি গল্প অবলম্বনে রচিত হলেও বাঙালী শিশুর মনে অফুরন্ত আনন্দের উৎস খুলে দেয়। উপরিউক্ত বইগুলি কেবল শিশু নয়, বালকদেরও উপভোগ্য, এমন কি এর মধ্যে কতকগুলি শিশু অপেক্ষা বালকদেরই বেশী উপযোগী।

ইংরিজি ছোটদের গল্প এবং বড়দের গল্পের মধ্যে বালকদের উপযোগী কোন কোন বইয়ের বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে, এবং মৌলিক ও বিদেশীর অনুকৃত ইস্কুলের গল্প (School Stories) জাতীয় বই কিছু কিছু বেরিয়েছে। কিন্তু এখনও এই শ্রেণীর ইংরিজি সাহিত্যের শতাংশের একাংশের অনুরূপও কিছু বাংলায় প্রকাশিত হয়নি।

বাংলায় কিশোর সাহিত্যের অভাবই সবচেয়ে বেশী। ছোটদের বাংলা উপন্যাস নেই বল্লেই হয়। আগেকার দিনে "অনাথ" ও "উত্তরাধিকারী" পাঠ করে আনন্দলাভ করেছি, কিন্তু আজকাল সেগুলি বোধ হয় পাওয়াও যায়না। ইংরিজিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের খুব সমাদর এবং বহু লেখকলেখিকা এক্ষেত্রে স্থায়ীসাহিত্যের সৃষ্টি করে যশ অর্জন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে শান্তা ও সীতা দেবীর কোন কোন উপন্যাসের প্রথমাংশে নায়িকার বাল্যজীবনসম্পর্কে এই শ্রেণীর চিত্র কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেউ সম্পূর্ণভাবে ছোটদের উপন্যাস রচনা করে নিজের প্রতিভার অর্ঘ্য কিশোরসাহিত্যে দেননি। কিশোরদের জন্য হাস্যরসপূর্ণ সাহিত্য সুকুমার রায়চৌধুরী রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর বালক ও কিশোরদের জন্য রচিত মজার মজার ইস্কুলের ছেলেদের গল্পের সমষ্টি "পাগ্‌লা দাশু" এবং "লক্ষ্মণের শক্তিশেল", "ঝালাপালা" প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটক যথোচিত প্রচার লাভ করেনি।

ছোটদের ঐতিহাসিক গল্পের দুটি শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম, সত্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে—যেমন, "রাজকাহিনী", "রাজাবাদশা", "রণডঙ্কা" ইত্যাদি; দ্বিতীয়, কোন বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে "রবিন হুড" জাতীয় উপন্যাস—যথা, "তান্তিয়ার বাহাদুরী", "বিশে ডাকাত" ইত্যাদি। ছেলেদের মনে স্বাজাত্যবোধ ও জাতিগৌরব জাগিয়ে তুলবার জন্য এগুলি মূল্যবান এইজন্য এই শ্রেণীর আরো বই রচিত হওয়া আবশ্যক এবং বাংলার লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলির পুনঃপ্রচলন চাই।

বাংলা বাল্য এবং কিশোর সাহিত্যে এড্‌ভেঞ্চার জাতীয় উপন্যাসেরই সবচেয়ে বেশী প্রচলন। এর দুটি শ্রেণী নির্দেশ করা যায়,—বিলিতি রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ বা অনুকরণ এবং মৌলিক রচনা। মৌলিক রচনার মধ্যে আবার দুটি বিভাগ দেখা যায়। একটি, যে সব ঘটনা সত্যই ঘটতে পারে, যেমন "যকের ধন" সিরিজের গল্পগুলি; অপরটির অন্তর্গত বইগুলি কাল্পনিক অসম্ভব ঘটনা নিয়ে রচিত, যেমন, "ময়নামতীর মায়াকানন", মঙ্গলগ্রহের কাহিনী এবং নানারকম ভূতের গল্প। মোটামুটিভাবে এই শ্রেণীর বইগুলির বিষয়ে অভিমত এই যে দুর্বলচিত্ত বাঙালীর মনে সাহসিকতার পিপাসা জাগিয়ে দিয়ে এগুলি খুব উপকার করে; কিন্তু তলিয়ে দেখলে এগুলিকে নিছক মঙ্গলপ্রদ বলে মনে করা দুষ্কর। বাঙালী কল্পনাবিলাসীর জাত, তার পক্ষে বিছানায় শুয়ে চন্দ্রলোকের ভ্রমণকাহিনী কল্পনা করা দুষ্কর নয় বলেই এরূপ কল্পনার আতিশয্য হানিকর হতে পারে। যদি বাংলায় বাস্তবজীবন অবলম্বনে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত বাল্য উপন্যাস-সাহিত্য বর্তমান থাকত তবে তার একপ্রান্তে রোমাঞ্চক কাহিনীগুলি স্থান পেলে ভালই হত; কিন্তু যখন ছোটদের সাহিত্যের অধিকাংশ এই উগ্র উত্তেজনাময় রূপ ধারণ করে তখন সত্যকার ভাবনার কথা হয়। এই বইগুলি থাক, কিন্তু বাঙালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি যাঁরা চান তাঁরা যদি শিশুসাহিত্যের পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য যত্ন নেন, তবেই বাঙালী বালক সামঞ্জস্যময় চরিত্র নিয়ে বড় হয়ে উঠবে।

ইংরিজি সাহিত্যের অপর একটি বিশিষ্ট শাখা আমাদের দেশে দেখা যায়না; ইংরেজেরা তাঁদের সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টা করেন

এবং এইজন্য ইংরিজি উপন্যাসাদির বহু শিশুসুলভ সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ প্রকাশিত করা হয়। আমাদের দেশে এরূপ চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। একটু উপরের শ্রেণীর কিশোরবয়স্ক ছাত্রকে এইগুলির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া যায়। বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলি বালকবালিকারা শিক্ষকের অতি অল্প সহায়তায় বুঝতে এবং উপভোগ করতে পারবে।

গল্প ও উপন্যাস ছাড়া গদ্য সাহিত্যের একটি বৃহৎ শাখা আছে, তার মধ্যে দিয়েই বালক ও কিশোর দেশবিদেশের, জ্ঞানবিজ্ঞানের, সাহিত্যেতিহাসের বিচিত্র তথ্যসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হয়।

আমাদের দেশের সাহিত্যের বা ইতিহাসের সঙ্গে বালকদের পরিচিত করে দেবার উপযোগী বই বাংলায় আছে কিনা সন্দেহ। সরস, সুন্দর সাহিত্যের ইতিহাস তো নেই-ই ; ভারতবর্ষের বা বাংলাদেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন বালপ্রিয় সংস্করণ বোধ হয় নেই। এই ভয়ানক অভাব দূর না হলে বাঙালী শিশু জাতীয়তার গৌরব নিয়ে বড় হতে পারবেনা।

বাংলায় ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী কিছু কিছু আছে, এবং সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্গত ভ্রমণকাহিনীর অনেকগুলিই সম্পূর্ণ না হোক, আংশিকভাবে ছোটরা বুঝতে পারবে। কিন্তু এখনও দেশবিদেশের বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীদের খবর আমাদের দেশের দরজায় পৌঁছায়নি।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই কিছুদিন থেকেই বাংলাসাহিত্যে অল্প অল্প করে প্রকাশিত হচ্ছে। "পোকামাকড়", "গাছপালা", "জীবজন্তু", "গ্রহনক্ষত্র", "বনেজঙ্গলে", "সেকালের কথা",

প্রভৃতি বহুদিনপ্রচলিত গ্রন্থ ছাড়াও আজকাল "জীবজগতের আজব কথা", "আজব বই" প্রভৃতি নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং বিশ্বকবি তাঁর "বিশ্বপরিচয়" ও "ছুটির পড়া" নিয়ে বালসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। সাধারণজ্ঞানের জন্য "শিশুভারতী" উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই জাতীয় ছোট ছোট দু'একটি বই বেরিয়েছে। এখনও বিজ্ঞানের সকল শাখার সম্পূর্ণ আলোচনা বাকি। বিজ্ঞান আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়েছে, এখন এই বিষয়ে পাঠ্য-বহির্ভূত বহু পুস্তকের প্রকাশ না হলে বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমাদের ছাত্রদের মধ্যে আসবে কি করে ?

মাসিক বা বার্ষিক সাময়িক পত্রিকা ছোটদের সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। সাময়িক পত্রিকায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্রবিষয়ক আলোচনা ভিন্ন যে নানা তাৎকালিক সংবাদ থাকে সেগুলি বালক ও কিশোরের উপযোগী ও আনন্দদায়ক। এ ছাড়া ধাঁধা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নানাপ্রকারের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

ছেলেদের সাময়িক সাহিত্যের বিশেষ অঙ্গ সংবাদপত্র। আমাদের দেশে যে একটিও ছোটদের সংবাদপত্র নেই, এ বড় দুঃখের কথা। সংবাদপত্রের মারফৎ বালক ও কিশোরদের বিশ্ব-জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু বড়দের পত্রগুলির রাজনৈতিক দলাদলির আবহাওয়া তাদের একেবারে অনুপযোগী। তাছাড়া বড়দের পত্রে বয়স্কের জ্ঞানের পরিপক্কতার অনুযায়ী ভাবে বিষয়গুলির আলোচনা থাকে, আর ছোটদের সামনে সেগুলির সহজ, সরল ব্যাখ্যা না দিলে তাদের পক্ষে

বোঝা কঠিন; এবং বুঝলেও তাদের অকালপক্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ছোটদের একটি খবরের কাগজের অভাব যতদিন না পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন বড়দের পত্রের অংশবিশেষ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করাই একমাত্র উপায়। কোন কোন বিদ্যালয়ে পত্রিকার নির্বাচিত কর্তিত অংশ টাঙাবার জন্য বিশেষ বোর্ড নির্দিষ্ট করা থাকে; এবং ছাত্রদেরও এরূপ অংশ সংগ্রহ করে আনবার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের যেমন মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা থাকে তেমনি ছাত্রপরিচালিত দৈনিক পত্রিকাও করা যায়। ইউরোপের অংশবিশেষে প্রচলিত দেওয়ালপত্রীর (wall newspaper) আদর্শে এ গঠিত হতে পারে। প্রতিদিন এক একটি বালক পূর্বনির্দিষ্ট এক একটি বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে লিখে এনে দেওয়ালের নির্দিষ্ট স্থানে টাঙিয়ে দেবে, এবং সমগ্র শ্রেণী তাই নিয়ে আলোচনা করবে। এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর ঘরের দেওয়ালে তত্তৎ শ্রেণীর পৃথক দৈনিক পত্রিকা রূপ লাভ করতে পারে।

পাঠক্রম

শিক্ষাবিধির নিয়মানুযায়ী শিক্ষকদের পাঠনের একটা ক্রম নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক ঘণ্টার পাঠ্য বিষয়বস্তুকে সেই অনুযায়ী সজ্জিত করে স্তরে স্তরে তার আলোচনা হয়।

জানা থেকে অজানায়, সরল থেকে কঠিনে, নিকট থেকে দূরে, বিশিষ্ট থেকে সাধারণে, বস্তু থেকে নির্বস্তুতে যাওয়ার নিয়মানুযায়ী শিশুর প্রত্যেক পাঠই পূর্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ভূমিকা বা উপক্রমণিকা পাঠক্রমের প্রথম অংশ। যদি উপস্থিত পাঠ্য পূর্বপাঠের অনুবৃত্তি হয়ে থাকে তবে ভূমিকারূপে পূর্বপাঠের পুনরালোচনা চাই; যদি পূর্বপরিচিত কবি বা লেখকের রচনা পাঠ্য বিষয় হয়ে থাকে তবে তাঁর পরিচিত রচনাগুলির উল্লেখ চাই; যদি পূর্বাধীত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় প্রস্তুত হয়ে থাকে তবে পূর্ববিষয়ের তুলনা চাই। সম্পূর্ণ নূতন বিষয় হলে পরিচিত কোন বস্তুর জ্ঞানের ভিত্তির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেমন নায়েগ্রা জলপ্রপাত পাঠ্যবিষয় হলে ভারতীয় কোন জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করে ভূমিকা করা যায়; দার্জিলিংএর বিষয়ে প্রবন্ধ পড়াতে হলে শিশুর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কোন পাহাড়ে দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায়; ব্যাকরণের অলঙ্কার পড়াবার সময়ে মানুষের অঙ্গের আভরণের উল্লেখ করা যায়। গল্প বলে ভূমিকা করার পদ্ধতিও ভাল। যেমন, দানশীলতার বিষয়ে প্রবন্ধ পড়াতে হলে ব্যক্তি-বিশেষের দানশীলতার কোন গল্প বলা যায়।

তবে শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভূমিকা দেওয়া যেন একটি নিষ্প্রাণ পদ্ধতিতে পরিণত না হয়। যেমন, সত্যেন দত্তের 'মেথর' এই কবিতাটি পড়াবার সময়ে মেথর যে সব পরিষ্কার করে সে কথাটির ভূমিকাস্বরূপ মায়ের সঙ্গে তার তুলনা অসার্থক, কেননা, মেথর যে কোন বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। উপক্রমণিকা মানে প্রস্তাবনা বা পাঠ্যবিষয়ের উত্থাপন। বিষয় অপরিচিত হলে কোন পরিচিত বস্তু বা কাহিনীর উত্থাপন করে তাকে ছাত্রের পক্ষে সহজবোধ্য করে দিতে হবে; নতুবা অনাবশ্যকরূপে বাইরের কথা না এনে সোজাসুজি বিষয়বস্তুতে উপনীত হওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' নামক কবিতাটি পড়াবার সময়ে কোন কাল্পনিক শিশুর কল্পনাপ্রবণতার কাহিনী দিয়ে ভূমিকা না করে, শিশুর মনের মধ্যে গোপনে যে বীরপুরুষটি তার অদম্য আকাঙ্ক্ষা-সমূহ নিয়ে বাস করে তার কথা মনে করিয়ে দিলেই সে পরম উৎসাহিত হবে; কিংবা এরোপ্লেনের বিষয়ে পড়াবার সময়ে আধুনিক সহুরে শিশুর কাছে পুষ্পকরথের উপমা দেবার প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ পুষ্পকরথের বিষয় পড়াতে গেলে এরোপ্লেনের উপমা দেবার দরকার হতে পারে। উপরের শ্রেণীতে উপক্রমণিকার সময়ে কবির জীবন ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে; নীচের শ্রেণীতে তার প্রয়োজন নেই, কেননা, ছোট শিশুর কাছে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সাধারণজ্ঞান আশা করা অন্যায়।

উপক্রমণিকার পর মূল পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা। এই অংশে শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণাদির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান চলে। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য পাঠ্যবিষয়টিকে ছোট ছোট

অংশে ভাগ করে নেওয়ার পদ্ধতি আছে, কিন্তু অপরপক্ষে সমগ্র জিনিষকে বিশ্লিষ্টরূপে দেখা সাহিত্যবোধের পরিপন্থী। এই দুইয়ের মিল করবার জন্য পূর্বে একবার সমগ্রভাবে বিষয়টির আলোচনা করে নিয়ে তারপর ব্যাখ্যা আরম্ভ করতে হবে। কবিতা-পাঠের সময়ে সমগ্র-দৃষ্টির প্রয়োজন বেশি। গদ্যের গতি স্বভাবতই ধাপে ধাপে কিন্তু কবিতার প্রাণ তার পূর্ণরূপের মধ্যে নিহিত; এই কারণে গদ্যের আংশিক আলোচনা কখন কখন সম্ভবপর হলেও কবিতার হয় না। এরপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিরও বিশিষ্ট ব্যাখ্যার পূর্বে সাধারণ ভাব গ্রহণ করে নিতে হবে, এবং ব্যাখ্যার সময়ে ব্যাকরণের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়, কেননা তাহলে ছাত্রের মন অর্থ ও ভাবের বোধ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ব্যাখ্যার সময়ে অর্থবোধকে প্রাধান্য দিয়ে পুনরালোচনার সময়ে ব্যাকরণের আলোচনা করা যেতে পারে। কবিতা পড়াবার সময়ে বিশেষ করে অনুভবের উপর প্রাধান্য দিতে হবে; ব্যাকরণের আলোচনা যতদূর সম্ভব গৌণভাবে থাকবে।

কবিতা বা সরস গদ্য পাঠ হলে উপস্থাপনের প্রথমে শিক্ষক আদর্শপাঠ প্রদান করবেন, যাতে ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব ছাত্রের মর্ম স্পর্শ করে।

ব্যাখ্যার সময়ে শিক্ষককে ছাত্রদের খাটিয়ে নেবার সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। উপক্রমণিকার সময়ে মোটামুটিভাবে শিশুর মন পাঠ্যবিষয়ের পরিচয় লাভ করেছে তাই ব্যাখ্যার মূল অংশের অনেকখানিই প্রশ্নদ্বারা শিশুর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া সম্ভব হবে। বিষয়বস্তু যদি কোন পরিচিত পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়ে

থাকে তবে ছাত্র তার পূর্বজ্ঞান থেকে অনেকটা বুঝে নিতে পারবে; গল্প বা কবিতা পাঠ্যবস্তু হলে ছাত্রকে স্বীয় সাহিত্যানুভূতির সাহায্যে মর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত বিষয়ের পাঠনের সময়েই শিক্ষককে ছাত্রদের সহযোগিতার অভাবে বিপন্ন হতে হয়; এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজের চেষ্টায় জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য না করে শিক্ষককে সবগুলি কথাই বক্তৃতার আকারে বলে দিতে দেখেছি। পরিদর্শনব্যপদেশে এই দোষটির প্রতি নির্দেশ করতে গিয়ে আপত্তি শুনেছি যে এরূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় পড়াবার সময়ে ছাত্রদের দিয়ে বিষয়বস্তুটি বলিয়ে নেওয়া অসম্ভব।

অসম্ভব কিছুই নয়, এরূপ বিষয়ের পড়াবার পদ্ধতি কেবল ভিন্ন। পাঠক্রম সাধারণত তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম, যে বিষয় ছাত্রেরা নিজেরা জানে, কেবল শিক্ষকের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান সজ্জিত এবং মার্জিত করে নিতে হবে, তার পাঠ। উদাহরণস্বরূপ বিমানপোতের কথা বলা যেতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে বিমানপোত দেখেনি বা বিমান আক্রমণের কাহিনী শোনেনি এমন কাউকে সম্ভবত দেখতে পাওয়া যায় না, কাজেই তাদের অভিজ্ঞতার উপর শিক্ষক কিছু সাহায্য করে কিছু নূতন জ্ঞান দিলে তারা সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বুঝে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে। দানশীলতা, মাতৃস্নেহ, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সাধারণ গুণ এবং খেলাধূলার কথা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয়, অনুভবের দ্বারা যে সব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় তার পাঠ, যেমন কবিতা বা গল্প। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রের মনে বিষয়বস্তু আপনি রেখাপাত করে, সেই প্রভাবকে উজ্জ্বল করে

তার সচেতনতার দ্বারে পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষকের কাজ, এবং তিনি কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রশ্নের দ্বারা এই কার্য সাধিত করতে পারেন। কবিতার আদর্শ পাঠের সময়ে শিক্ষকের আবৃত্তি করবার গুণে তার ছন্দ, ভাব, রস প্রভৃতির ছাত্রদের "কানের ভিতর দিয়ে" মর্ম্ম স্পর্শ করা চাই এবং তাদের মনে অনুরূপ আবেগের উদ্রেক করা চাই, নতুবা সে পাঠ সফল হবেনা।

তৃতীয়, শিশুর অজানা জ্ঞানবিজ্ঞান বা অলঙ্কার ব্যাকরণাদি বিষয়ের পাঠ। এই শ্রেণীর পাঠে ছাত্রদের সহযোগিতালাভ কঠিনতম বলে গণ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের মস্তিষ্ক পরিচালনা করানোর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, যেমন, গ্রহনক্ষত্রের কথা, ম্যালেরিয়া ও তার চিকিৎসার ইতিহাস, শারীরতত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ, নূতন নূতন আবিষ্কারের কাহিনী, চার্ট, ছবি, ম্যাপ, মডেল, নমুনাদ্বারা এত চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বলভাবে ছাত্রের সম্মুখে তুলে ধরা যায় যাতে তারা নিজেরাই বিষয়ের মূল কথাগুলি বুঝে নিতে পারে। ব্যাকরণের পাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে ঐ পথ অনুসরণ করা যায়; ব্যাকরণসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে যে ভাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাতে ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্ব স্তরের অভিজ্ঞতাটুকু পূর্বজ্ঞান-হিসাবে পাওয়া যাবে; তার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পথ অনুসরণ করলে ছাত্রের মস্তিষ্কপরিচালনাদ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ 'বিশেষ্য' বিষয়ের পাঠের ক্রম নির্দেশ করা যায়। প্রথমাবস্থায় শিশু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের সামান্য সাহায্যেই আবিষ্কার করে

যে, যে সমস্ত শব্দ সে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে সেগুলি নানা শ্রেণীতে বিভাজ্য। তারপর সেই শ্রেণীসমূহের মধ্যে একটি যে (বস্তু, ভাব বা ব্যক্তির) 'নাম' বোঝায় এবং তাকে যে বিশেষ্য বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে একথাও শিখে নেওয়া দুষ্কর হবেনা। "বিশেষ্য" এই শব্দটা যখন সে শিখবে তখন বিশেষ্যের সমস্ত বিবরণই পূর্বজ্ঞানরূপে তার সাহায্য করবে, নামটি মাত্র নূতন। বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগশিক্ষাও ঠিক যে ভাবে শব্দসমূহের শ্রেণীবিভাগের কথা শেখা হয়েছিল সেই ভাবেই হবে। এমন কি ব্যাকরণের অধিকাংশ নামেরই অর্থ থাকার দরুণ নামগুলি পর্যন্ত ছাত্রকে অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হবে না। এই পদ্ধতির ব্যবহার যদি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পযন্ত চলে তবে শিক্ষককে কখনও ছাত্রদের সহযোগিতার অভাবের জন্য দুঃখ করতে হবেনা।

পাঠের উপস্থাপন শেষ হলে পুনরালোচনা করতে হবে। পুনরালোচনার দ্বারা ছাত্র তার পঠিত বিষয়ের নূতন জ্ঞানসমূহ গুছিয়ে নেবার সুযোগ পায়; দ্বিতীয়বার আলোচনার ফলে বিষযটি তার মনে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং প্রথমবারে হয়ত যে সকল বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয়বারে সেগুলি লক্ষিত হয়। সাধারণত উপস্থাপনের সময়ে পাঠ্যবিষয়টি যে পদ্ধতিতে আলোচিত হয় পুনরালোচনায় তদপেক্ষা ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এতে বিষয়টি একঘেয়ে লাগতে পারে না এবং দুইবারে দুরকমভাবে আলোচনা করার ফলে ধারণা উজ্জ্বলতর হয়। যেমন, কোন গল্প বা কবিতার উপস্থাপনের সময়ে যদি তার কাহিনীর আলোচনা প্রধান হয়ে থাকে তবে পুনরালোচনার সময়ে ভাষার বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে পারা যায়, অথবা বিশিষ্ট ঘটনা বা চরিত্রের আলোচনা করা যায়।

পাঠক্রমের সর্বশেষ অংশ প্রয়োগ বা অধীত বিষয়ের পরীক্ষা। বিষয়টি ছাত্রেরা বুঝেছে কিনা এই অংশে শিক্ষক তা জানতে পারেন এবং ছাত্রদের মনে কোন সংশয় বা ভুল ধারণা থাকলে তার নিরসন হতে পারে। পাঠ পরিদর্শনের সময়ে লক্ষ্য করেছি অনেক সময়ে প্রয়োগের বিষয়টিকে অবহেলা করা হয়ে থাকে। রচনা ও প্রবন্ধের আলোচনার সময়ে বলেছিলাম যে, যে কোন বিষয়ের লেখার কাজ দেবার আগে তদ্বিষয়ের দীর্ঘ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন: এই সূত্র অনুসরণ করে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে সাধারণ একটি সম্পূর্ণ পাঠের পর দীর্ঘ আলোচনা করে লিখতে দেওয়া একঘণ্টা (period) সময়ের মধ্যে কুলিয়ে ওঠা কঠিন—প্রায় অসম্ভব। এই কথা ভেবে শিক্ষকেরা পাঠের শেষে যত কম লিখতে দেন ততই ভাল। যদি বিষয়টি এমন হয়ে থাকে যে পাঠক্রমের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে লেখান যায়, অথবা যদি এমন প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে যার উত্তর দেওয়া সময়সাপেক্ষ নয় তবেই লেখার কাজ দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হয়ত একটি গল্প পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে তার প্রধান চরিত্রগুলির নাম লিখতে বলা হল, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' পড়িয়ে গুপ্তধনের অনুসন্ধানকারীদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দেশ করতে বলা হল।

লেখা ভিন্নও নানা প্রকারে পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োগ চলে। প্রয়োগের সফলতা শিক্ষকের যত্ন, বুদ্ধি ও মৌলিকতার উপর নির্ভর করে। পরিদর্শনের সময়ে যে দু'একটি পাঠের প্রয়োগের

উৎকর্ষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার উল্লেখ করব। তৃতীয় শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' চিত্রের সাহায্যে পড়ান হয়েছিল। "শিশুভারতী"তে যেরূপ প্রত্যেক অনুচ্ছেদে একেকটি করে চিত্র দেওয়া আছে সেই আদর্শে শিক্ষয়িত্রী বড় বড় ছবি এঁকে এনেছিলেন। প্রয়োগের বিষয় ছিল কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে ছবিগুলির নামকরণ। এতে পারম্পর্যা-নুসারে প্রত্যেক ছবির নাম করতে গিয়ে গল্পটির পুনরালোচনা হয়ে গেল, উপরন্তু কবিতা থেকে ছবির উপযোগী উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ছাত্রেরা সাহিত্যবোধের পরিচয় দিল।

চতুর্থ শ্রেণীতে 'ভাতের জন্মকথা'র উপর ভিত্তি করে, চিত্রের সাহায্যে ধানের চাষ ও চালের উৎপত্তিসম্বন্ধে পড়ান হয়েছিল। প্রয়োগের সময়ে ছাত্রদের চিত্রগুলিকে পারম্পর্যানুসারে সাজিয়ে দিতে বলা হল। ধানের চাষের সমগ্র কাহিনীটি তারা অনুসরণ করেছে কিনা তার প্রমাণ এর থেকে হয়ে গেল।

অষ্টম শ্রেণীতে গ্রাম্যজীবনের বর্ণনার কোন কবিতা পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষা-পকর্ষের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। এতে গ্রামের যে গুণবর্ণনা ছাত্রেরা পড়ল সেটা তারা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তার পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সব বিষয়ের দুইদিক দেখে বিচার করবার ক্ষমতা বর্ধিত হল।

নবম শ্রেণীতে দীনেশচন্দ্র সেনের 'দশরথ' পড়িয়ে প্রয়োগে রামের বনবাসসম্বন্ধে কার কতটা দায়িত্ব সেই আলোচনা হয়েছিল। এতে সমগ্র বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পক্ষপাতহীনভাবে আলোচনার অভ্যাসও হল; কেননা, দশরথের দায়িত্বটুকুর বহু অংশীদার রয়েছে বলে এই

আলোচনায় তর্কের মত কেবল দুটি দিক দর্শন করা সম্ভব হয়নি।

এই শ্রেণীতেই অলঙ্কারবিষয় পড়িয়ে প্রয়োগে বৃক্ষের ফলের মধ্যে সেগুলির নাম লেখান হয়েছিল। শিক্ষয়িত্রী একটি শাখায় দুইগুচ্ছ ফল এঁকে এনেছিলেন, ছাত্রেরা একগুচ্ছের প্রত্যেকটি ফলে একটি করে শব্দালঙ্কারের ও অপর গুচ্ছের প্রত্যেকটি ফলে একটি করে অর্থালঙ্কারের নাম লিখল। বলা বাহুল্য, ফলের সংখ্যা অলঙ্কারের সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট করা ছিল। এতে মস্তিষ্কচালনার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হলনা বটে কিন্তু চিত্রের মধ্য দিয়ে অলঙ্কারের নাম ও শ্রেণীবিভাগ উজ্জ্বল হয়ে ছাত্রদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল।

দশম শ্রেণীতে ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়ে প্রয়োগের সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছিল। এতে দুটি উপকার হল; প্রথমত, উক্ত প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আছে মাত্র, তার উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা করে তবে সে বিষয়ের জ্ঞান পূর্ণতালাভ করল; দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে জগতের একাংশ অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা, কাজেই ছাত্রদের মনে বিশ্ব ও ভারতের তুলনার কথা জাগিয়ে দেওয়া খুবই উপযোগী হয়েছে।

পুনরালোচনা দীর্ঘ এবং দুই অংশে বিভাজ্য হলে পৃথক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। উপরিউক্ত প্রয়োগের উদাহরণের মধ্যে অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত। এগুলির অধিকাংশের মধ্যেই পুনরালোচনা এবং পরীক্ষা দুই এক সঙ্গে হয়েছে; বিশেষত তর্ক এবং আলোচনার জন্য প্রথমে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমস্ত

বিষয়টি তৈরী করে নিয়ে তারপর তর্ক অথবা আলোচনা করলে আপনা থেকে পুনরালোচনা ও প্রয়োগ দুই হয়ে যায়।

বোর্ডের কাজ পাঠক্রমের অন্তর্গত। ছবি, চার্ট, ইত্যাদি থাকলেও শিক্ষক যা পড়াবেন তার টীকা ইত্যাদি বোর্ডে লিখে দিলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে ছাত্রের মনে থাকবে। বোর্ডের কাজ সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়, সংক্ষিপ্তসার ও শব্দার্থ। এই উদ্দেশ্যে ক্লাসে দুটি বোর্ড থাকা ভাল। বোর্ডে ছবি আঁকা নীচু ক্লাসেব খুব চিত্তাকর্ষক হলেও উপরের ক্লাসের ছাত্রদের চিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করবার ক্ষমতা থাকে বলে শিক্ষকের চিত্রাঙ্কণক্ষমতা খুব ভাল না হলে একাজ নিরাপদ নয়। তবে উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষক তৎপরতার সঙ্গে নক্সা, মানচিত্রাদি আঁকতে পারলে ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। বিজ্ঞান, ভূগোল, শরীরতত্ত্ব, প্রকৃতি-পরিচয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়াবার সময়ে চিত্র, মানচিত্র, নক্সা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে উৎকৃষ্ট ছবি আঁকতে পারলে ভাল হয়।

বোর্ডের কাজ ভিন্ন পড়াবার সময়ে উপকরণ বা কয়েকটি সরঞ্জামের (Apparatus) প্রয়োজন হয়। বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করবার জন্য যে সব চিত্র, মানচিত্র, নক্সা, মডেল, নমুনা, পরীক্ষার (Experiment) যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। উপকরণের উপযোগিতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন, যে ক্লাসের ছাত্রেরা ভূগোলে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি তাদের দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র এনে ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান নির্দেশ করতে বলা অনুপযোগী; অথবা ঘোড়ার বিষয়ে প্রবন্ধপাঠের সময়ে ক্লাসঘরে একটি জীবন্ত ঘোড়া উপস্থিত করা ততোধিক

অনুপযোগী। ছবি যদি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট না হয় তবে উঁচু ক্লাসে দেখাবার কোন প্রয়োজন নাই। নীচের ক্লাসে যেমন ছড়া, গল্প, যাই পড়ান হোকনা কেন, সঙ্গে ছবি দিতে হয়, উঁচু ক্লাসে তা নয়।

সম-উক্তিসংকলন পাঠক্রমের আর একটি অঙ্গ। ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির মত সম-উক্তিও ছাত্রের মনে পাঠ্যবিষয়টিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে; তাছাড়া বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে সাহিত্যজ্ঞান, সাহিত্যানুভব ও সাহিত্যের ঐক্যানুভূতির দিক দিয়ে এর উপযোগিতা আছে। তবে সম-উক্তিতে যেন সত্যকার সাদৃশ্য বর্তমান থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অতিরিক্তসংখ্যক সম-উক্তি না দেওয়াই ভাল, কেননা, তার দ্বারা ছাত্রদের মন বিভ্রান্ত এবং মূল বিষয় থেকে বিকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষক যদি বক্তৃতার আকারে পাঠ্যবস্তুর ব্যাখ্যা করেন তবে ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। বালস্বভাব এই যে, দেহ অথবা মন যা দিয়েই হোকনা কেন সে সর্বদা এগিয়ে গিয়ে আলোচ্য বিষয়টিকে আক্রমণ করতে চায়; ধীরভাবে বসে ভাবগ্রহণ করবার জন্য সে তৈরী হয়নি। কাজেই পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে শিশু নিজের উৎসাহ ও চেষ্টার দ্বারা বিষয়বস্তুটিকে আয়ত্ত করতে পারে। পূর্বে বলা হয়েছে যে নূতন পাঠ ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তার মনে যা অসজ্জিত তাকে সজ্জিত করে, এবং যা অচেতনে বিরাজিত তাকে চেতনলোকে এনে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত পাঠ। এর জন্য প্রশ্নের দরকার। ছাত্র অনেক সময়ে উত্তরটা জানে,

অথবা একটু ভাবলেই বলতে পারে, কিন্তু মনে চিন্তা উদ্রিক্ত না হওয়ার দরুণ ভেবে দেখেনা; সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের দু'একটি সুচিন্তিত প্রশ্নের ফলে সমস্ত কথাটিই তার মনে হয়ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনেক সময়ে এমন হয় যে শিক্ষক হয়ত খুব সহজ একটি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ছাত্রেরা কিছুতেই উত্তর দিতে পারলনা; তখন শিক্ষক যদি উত্তরটি না বলে দিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকেন তবে হয়ত অবশেষে উত্তরটি ছাত্রদের কাছ থেকেই আদায় করতে পারবেন। অনেক সময়ে প্রশ্নটি ধরতে না পারার দরুণও এরূপ হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নটির আকাব পরিবর্তন করে দেওয়া দরকার। উদাহবণ-স্বরূপ বলা যায় যে, "গরু আমাদের কি কি উপকাব করে?" এই প্রশ্নের উত্তর যদি নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা না দিতে পাবে, "গরুর কোন্ কোন্ জিনিষ আমাদের কাজে লাগে?" জিজ্ঞাসা কবলে হয়ত কিছু বলতে পারবে, এবং তাও না পারলে গরুর প্রতি অংশ নিয়ে পৃথক পৃথক প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তরপ্রাপ্তিব সুবিধার জন্য অনেক শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যার মধ্যে উত্তরটি নিহিত থাকে (leading or suggestive questions); এরূপ প্রশ্নের একটি লক্ষণ এই যে "হ্যাঁ" অথবা "না" একটি কথার দ্বারা তার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর। যথা, "গরু আমাদের খুব উপকার করে, না?" এর উত্তরে ছাত্রেরা নিশ্চয় বলবে "হ্যাঁ"। উত্তর সহজলভ্য হলেও এরূপ প্রশ্ন ছাত্রদের মস্তিষ্কপরিচালনায় কিছুমাত্র সাহায্য করেনা বলে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী।

ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্র যাতে প্রশ্নের উত্তর দেবার সমান সুযোগ পায় (distribution of questions) প্রশ্ন করবার

সময়ে শিক্ষককে সেইদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীতেই এমন দু'একটি বুদ্ধিমান ছাত্র দেখা যায় যারা সব প্রশ্নের উত্তর সর্বাগ্রে ধরতে পারে; কাজেই শিক্ষক যদি সাধারণভাবে প্রশ্ন করেন তবে বুদ্ধিমানেরাই তার দ্বারা উপকৃত হবে এবং অপরেরা হয়ত পাঠ অনুসরণ করবার সুবিধা পাবেনা। এইজন্য শিক্ষককে প্রত্যেকবার ছাত্রদের নাম করে করে কে উত্তর দেবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বুদ্ধিহীন বালকও যাতে বুদ্ধিমান বালকের সঙ্গে প্রশ্নের ও পাঠের সমান অংশ পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা। প্রশ্ন করার পদ্ধতি এই যে প্রথমে শিক্ষক সাধারণভাবে সমগ্র শ্রেণীর সম্মুখে প্রশ্নটি ধরবেন, তারপর যে বালককে উত্তর দিতে হবে তার নাম করবেন। এতে লাভ এই হয় যে প্রশ্ন করার এবং নির্দিষ্ট বালকের নাম ডাকার মধ্যবর্তী সময়টুকু সকলকেই উত্তরটা ভেবে রাখতে হয়, কারণ শিক্ষক কার নাম ডাকবেন তা তারা জানেনা; এতে প্রশ্নের উত্তর দেয় যদিও একজন, কিন্তু মস্তিষ্কপরিচালনা করতে হয় সকলকেই।

পাঠক্রমে ছাত্রদের বয়স এবং পাঠের উদ্দেশ্যের উল্লেখ করবার নিয়ম আছে। বয়সের নির্দেশ পাঠের আদর্শনির্ণয়ের জন্য। একই বিষয় বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী অবধি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকতে পারে; কাজেই ছাত্রদের বয়সের তারতম্যানুযায়ী পাঠনরীতির ভিন্নতাদ্বারা বিষয়বস্তুর উপযোগিতা সম্পাদন করতে হবে। পাঠের উদ্দেশ্যও নানাপ্রকার হতে পারে। হয়ত একটি কবিতা নিম্নশ্রেণীতে অর্থবোধ করিয়ে পড়ালেই যথেষ্ট হবে, অথচ উপরের শ্রেণীতে সেটিকেই সাহিত্যের এবং কবিজীবনের ধারার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখাতে না পারলে পাঠ অসম্পূর্ণ থাকবে। তাছাড়া যে কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প পাঠ্য থাকবে তার বিশেষ গুণাগুণের অনুসারে উদ্দেশ্যের উপযোগিতা নির্ণীত হয়। যেমন "ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল" নামক প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য "সাহিত্যানুরাগবর্ধন", অথবা হাস্যরসাত্মক কবিতার উদ্দেশ্য "নৈতিক উন্নতি" হলে একেবারেই অনুপযোগী হবে।

আজকাল নানা নূতন নূতন পাঠনপদ্ধতির ব্যবহারের দ্বারা পাঠক্রমের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষত বঙ্গভাষার পাঠনে সে সব পদ্ধতি এখনও বহুলভাবে প্রচলিত হয়নি বলে তার ত্রুটির বিষয়ে কেবল সামান্য আলোচনা করব।

একটি পদ্ধতিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী না পড়িয়ে কোন কাজ অবলম্বনে (project) ভাষার ব্যাবহারিক জ্ঞান দান করা হয়। যেমন ছাত্রেরা হয়ত একটি দোকান খুলেছে; দোকানের নাম এবং লেবেল ও জিনিষের বিজ্ঞাপন পাঠ করে, নিজে হাতে সুন্দর করে লিখে, খাতায় জমাখরচের হিসাব করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা বাংলা ভাষা বলা, পড়া ও লেখার ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করবে। তাছাড়া কাজের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার জ্ঞানলাভ করলে মাতৃভাষার সঙ্গে ও বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে ছাত্রদের জীবনযাত্রার নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হবে এবং সমগ্র পাঠ্য বিষয়গুলিরও পরস্পর যোগ স্থাপিত (correlation of subjects) হবে। এই কাজ একদিনে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা; একে বিদ্যালয় জীবনের একটা স্থায়ী অংশ করে তুলতে না পারলে এর উদ্দেশ্য সফল হবেনা। প্রত্যহ, বা সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকদিন, এর জন্য পৃথক

ঘণ্টা চিহ্নিত করে দেওয়া চাই। সাধারণত ছেলেরা শ্লেট, পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে চকোলেট, লজেঞ্জুষ, চীনাবাদাম প্রভৃতি যে সব জিনিষ বাইরে কিনে অভ্যস্ত, এইভাবে বিদ্যালয়ের মধ্যেই সেগুলি পাবার ব্যবস্থা করলে ছাত্রদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে এবং তারা কি ভাবে টাকাপয়সা খরচ করছে না করছে সেদিকে শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখতে পারেন।

এইভাবে ডাকঘর ও রেলষ্টেশনের খেলা, বাগান করা, ক্লাসের পুস্তক সংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নানা কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা আনন্দ পাবে, কর্মপটুতা লাভ করবে এবং ভাল করে মাতৃভাষার ব্যবহার করতে শিখবে। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে ভূগোল, অঙ্ক, প্রকৃতি-পরিচয় প্রভৃতি সকল প্রকার বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারবে; এতে বিদ্যালয়ের অধীত বিষয়ের পরস্পরের সঙ্গে এবং সকলের মাতৃভাষার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হবে এবং ঘর বাহির ও বিদ্যালয়ের একটি সামঞ্জস্যময় ধারণা ছাত্রেরা লাভ করবে।

উপরের শ্রেণীর ছেলেরা বিদ্যালয়ের ইউনিয়ন গঠিত করে, সাহিত্য-সমিতি এবং খেলা বা অভিনয়ের ক্লাবের পরিচালন করে, ক্লাসের গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করে, আলোচনা সভা এবং উৎসবাদি আমোদ প্রমোদ উপলক্ষ্যে এবং স্কাউটিং, বিদ্যালয়ের পত্রিকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা লাভ করে। এ ছাড়াও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদের দিয়ে কোন একটি দেশহিতকর কাজ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কাজ অর্থ চাঁদা তোলা বা একদিন স্বেচ্ছাসেবক হওয়া নয়; শিক্ষাবিস্তার, আতুরের সেবা প্রভৃতি কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজ।

দ্বিতীয় যে পদ্ধতির উল্লেখ করব সেটিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মধারার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া প্রথমটির মত সহজ নয়। প্রথমটি যেমন ছাত্রদের ব্যাবহারিক শিক্ষা ও কর্মতৎপরতার সহায়ক, দ্বিতীয়টি তেমনি জ্ঞানানুসন্ধানের উদ্বোধক। এই পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়মিতভাবে, ঘণ্টা ধরে পড়ান হয়না; বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও পুস্তকাদি দ্বারা সজ্জিত একটি করে ঘর থাকে, সেই ঘরে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষা দেবার জন্য অপেক্ষা করেন। প্রত্যেক ছাত্রকে তার সপ্তাহের বা মাসের অধ্যায় চিহ্নিত করে দেওয়া হয় (assignment) এবং সে স্বাধীনভাবে উপযাচক হয়ে শিক্ষকদের সাহায্যে এবং পুস্তক ও অন্যান্য পাঠোপকরণাদির ব্যবহার করে শিক্ষালাভ করে। এর উপকারিতা এই যে নিজের চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করতে হয় বলে ছাত্রেরা জ্ঞানের মূল্য বুঝতে শেখে ও তাদের দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়। তাছাড়া জ্ঞানের সকল উপকরণ ও আধার তাদের সম্মুখে থাকাতে তাদের জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি পায় এবং পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা অথবা মুখস্থ করে কোনমতে পরীক্ষা পাশ করা তাদের উদ্দেশ্য হতে পারেনা।

সাধারণ ক্লাসের পড়ার মধ্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। মাদাম মন্তেসরির শিক্ষার যে পদ্ধতি অনেক বিদ্যালয়ে অনুসৃত হয় তার দ্বারা শিশুকে শিক্ষার নানা যন্ত্রপাতিপূর্ণ ঘরে, ইচ্ছানুযায়ী একেকটি জিনিষ হাতে ধরে, তার ব্যবহার করে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করতে শেখান হয়। বাংলা ভাষার শিক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

কোন কোন বিদ্যালয়ে উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ সুযোগের জন্য একেক বিষয়ের আলোচনার উপকরণ ও গ্রন্থাদির দ্বারা সজ্জিত পৃথক ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। সাধারণত শিল্প (কোন কোন বিদ্যালয়ে "শিশুশিল্পাগার"ও আছে), ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-পরিচয়ের জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে; সাহিত্যালোচনার জন্যও এরূপ ব্যবস্থা করলে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।
